মাসিক
আত-তাহরীক

১৪তম বর্ষঃ ৯ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধ :**
- পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/১২ কিস্তি)* ০৪
  -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত *(৫ম কিস্তি)* ১৬
  -মুযাফফর বিন মুহসিন
- পলাশীর মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি ও আমাদের শিক্ষা ২০
  -ড. এএসএম আযীযুল্লাহ
- ফৎওয়া : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ *(২য় কিস্তি)* ২৫
  -শিহাবুদ্দীন আহমাদ
- ওয়াহ্হাবী আন্দোলন : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব ২৯
  -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- লাইলাতুল মি'রাজ : করণীয় ও বর্জনীয় ৩৪
  -শেখ আব্দুছ ছামাদ
- গাদ্দাফী, সাম্রাজ্যবাদ ও লিবিয়ার রক্তাক্ত জনগণ ৩৮
  -ফাহমিদ-উর-রহমান

✡ **কবিতা :** ৪০
- ক্লান্ত পথিক
- শেষ নবীজির পথ
- মানব দানব
- ফাঁকি

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪১
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৪
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

সম্পাদকীয়

(১) মিসকীন ওবামা, ভিকটিম ওসামা, সাবধান বাংলাদেশ

জনগণের আশা-আকাংখার প্রতীক হয়ে আমেরিকার ক্ষমতায় এলেন বরাক হোসায়েন ওবামা। তাঁর কথায় ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক নোবেল কমিটি তাঁকে অল্প দিনের মধ্যেই শান্তিতে 'নোবেল' পুরস্কারে ভূষিত করলেন। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তিনি যত ভাল মানুষই হন না কেন, আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি ও তার শোষণবাদী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পলিসির কোন পরিবর্তন হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদের চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৭)*। আমেরিকা এখন সেই পরিণতিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের ৩৩১টি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে। হাযার হাযার কর্মচারী-কর্মকর্তা চাকুরী হারিয়েছেন। এমনকি এ মাসেই খোদ নিউইয়র্ক সিটিতে ছয় হাযার শিক্ষক চাকুরী হারাতে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই সেদেশে প্রতি ৭ জনের মধ্যে ১ জন হতদরিদ্র। আমেরিকার এখন নাভিশ্বাস উঠে গেছে। তাই চিরবৈরী গণচীনের কাছে তাকে হাত পাততে হয়েছে। তাদের কাছে সে এখন তিন হাযার বিলিয়ন ডলারের বিশাল অংকের ঋণের জালে আবদ্ধ। ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার, গুয়ান্তানামো বে কারাগার বন্ধ, দেশের অর্থনৈতিক মন্দা দূরীকরণ প্রভৃতি কোন নির্বাচনী ওয়াদাই ওবামা পূরণ করতে পারেননি। এদিকে চার বছরের মেয়াদও শেষের পথে। ঐতিহ্য অনুযায়ী আগামী ২০১২ সালের নির্বাচনে তাঁকে দ্বিতীয় মেয়াদে জিততে হবে। নইলে বড়ই লজ্জার কারণ হবে। কেননা এটাই সেদেশের ভাল প্রেসিডেন্টদের নিদর্শন। ওবামা তাই এখন বড়ই মিসকীন।

একদিকে অর্থনীতি উদ্ধার অন্যদিকে ক্ষমতা উদ্ধার। দু'দিকেই সামাল দেবার জন্য তিনি তাঁর পূর্বের প্রেসিডেন্ট বুশের পথ ধরেছেন। তিনি তাঁর সময়ে অর্থনীতি ও রাজনীতি উদ্ধারের জন্য দু'টি নোংরা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন। এক- মুসলিম বিশ্বের তৈল সম্পদ লুট করা এবং দুই- মুসলিম সংস্কারবাদী আন্দোলনগুলিকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী আন্দোলন হিসাবে বদনাম করা ও তাদেরকে উৎখাত করা।

ইংরেজরা ইতিপূর্বে বিশ্ব শোষণ করেছে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা তাদেরই দেশ। ভারতবর্ষ ছিল তাদের এককালের শোষণভূমি। তাই সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে আফগানিস্তানে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল এখানে। আফগানীদের ইসলামী জোশকে কাজে লাগালো অর্থ দিয়ে অস্ত্র দিয়ে।

সঊদী আরবের বিখ্যাত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বিন লাদেন কোম্পানী-র অন্যতম উত্তরসুরী প্রকৌশলী উসামাকে একাজে লাগানো হ'ল। প্রায় দশ বছরের (১৯৭৯-৮৯) রক্তক্ষয়ী লড়াই শেষে রাশিয়া বিতাড়িত হ'ল। তালেবান নেতাদের হোয়াইট হাউজে ডেকে নিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেওয়া হ'ল। কিন্তু বাগে ফিরলো না তালেবানের ইসলামী সরকার। তারা আফগানিস্তানের সম্পদ অন্যকে দেবে না। নিজেদের সম্পদ নিজেদের বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করবে। স্বার্থে আঘাত লাগলো। অতএব এবার তালেবান সরকার উৎখাতের পালা। গণতন্ত্রের সুড়সুড়ি দিয়ে বিরোধী দলগুলির মাধ্যমে সে কাজ সারা হ'ল। পুতুল সরকার ক্ষমতায় এলো। এবার রাতারাতি তালেবান হ'ল সন্ত্রাসী দল। ওসামা ও মোল্লা ওমর হ'লেন বিশ্বের সেরা জঙ্গী। অতঃপর সরাসরি হামলার অজুহাত সৃষ্টি করা হ'ল। ৯/১১-এর নাটক মঞ্চস্থ হ'ল। তিন হাযার লোক মারা গেল। কিন্তু ১৩০০ ইহুদী কর্মকর্তা-কর্মচারীর কেউ ঐদিন কাজে গেল না। এমনকি ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রীর আগের দিনের সফর বাতিল করা হ'ল। ঘটনার সাথে সাথে ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে প্রেসিডেন্ট বুশ বিবৃতি দিলেন। অথচ ওসামার ওয়েব সাইটে ১১-২৪ সেপ্টেম্বর ১৩ দিনের মধ্যে ৪ বার ঘোষণা এল যে, তিনি বা তার সংগঠন এতে জড়িত নয়। এই মর্মান্তিক ট্রাজেডীর তদন্ত রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয়নি। অথচ ঘটনার মাত্র ২৮ দিনের মাথায় ২০০১ সালের ৭ই অক্টোবর আফগানিস্তানে সরাসরি হামলা করল আমেরিকা ও ন্যাটো জোট। আফগানিস্তানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হ'ল। কিন্তু ওসামাকে পাওয়া গেল না। শোষণ-শাসন দু'টিই চলতে থাকল। ৩ বছর ৯ মাস পর ২০০৫ সালের ১৯ জুন বুশ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি বললেন, ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কোন অকাট্ট প্রমাণ মার্কিন প্রশাসনের কাছে নেই। সে জন্যই তিনি কোন এলাকায় আছেন, সে সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা থাকা সত্ত্বেও তারা তাকে গ্রেফতার করতে পারছেন না। কারণ গ্রেফতার করলে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে। সেই মামলায় সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে তাকে মুক্তি দিতে হবে'। প্রশ্ন হ'ল, সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত থাকার কোন প্রমাণ না থাকলে কিসের ভিত্তিতে তারা আফগানিস্তানের মত একটা স্বাধীন দেশের উপর হামলা চালালো? জবাব রয়েছে তাদের কাছেই। ২০০৫ সালের ২৮শে অক্টোবর ভার্জিনিয়ার সেনা সদরে দেয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন, বিগত শতাব্দীর পতিত সমাজতন্ত্রের মতোই বর্তমান শতকে ইসলামী মৌলবাদ বিশ্বের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ... একে অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করতে হবে'।

একই কথা প্রযোজ্য ইরাকের ক্ষেত্রেও। গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র মওজুদ রাখার অভিযোগে তারা ২০০৩ সালের ২০শে মার্চ ইরাকে হামলা চালিয়ে তা দখল করে নিল। কিন্তু সেদিন বা আজও তারা সেখানে কিছুই পায়নি। তাহ'লে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে ও টন কে টন বোমা মেরে লাখ লাখ বনু আদমকে হত্যা ও পঙ্গু করার এবং সবশেষে একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসায়েনকে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার দায়-দায়িত্ব কে নেবে? হাঁ তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানুষ তাদের লক্ষ্য ছিল না, ভূগর্ভের তৈল ছিল তাদের লক্ষ্য। সেটা তারা ষোলআনা পেয়েছে। এখন তারা ইরাকের পুতুল সরকারের কাছ থেকে তাদের ইরাক যুদ্ধের পুরো খরচ আদায় করছে। বর্তমানে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলির দিকে তারা থাবা বিস্তার করেছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার তাদের ফাঁকা বুলি মাত্র।

দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হবার জন্য বুশ তার দেশবাসীকে বিন লাদেন জুজুর ভয় দেখিয়ে ভোটে পাস করেছিলেন। এবারেও দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হবার জন্য ওবামা তুরুপের তাস হিসাবে ওসামাকেই ব্যবহার করেছেন। অথচ রোগাক্রান্ত ওসামা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন হয়তবা বহু বছর পূর্বে। দুনিয়াবাসীকে যা জানতে দেওয়া হয়নি। আমেরিকা তাই ওসামাকে মারেনি। বরং তাকে ভিকটিম বানিয়ে 'ওসামা হত্যা'র আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে মাত্র। ঘুমন্ত নিরস্ত্র ওসামা হত্যাকারী বীর (?) হিসাবে ওবামা মার্কিন ভোটারদের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ভোট চাইবেন। কিন্তু কে না জানে যে নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার মধ্যে কোন গৌরব নেই। তাই বিশ্ব নিন্দার মুখে ওবামা এখন বড়ই বিব্রত।

গত ২রা মে গভীর রাতে রাডার ফাঁকি দেওয়া চোরা (স্টিল্‌থ) হেলিকপ্টারে করে এসে পাকিস্তানের এবোটাবাদের সামরিক কেন্দ্রের নাকের ডগায় ওসামা হত্যার মহড়া চালিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিস্তারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী শক্তি হিসাবে নামানো হয়েছে ইউরোপকে। দৃশ্যপটের পাদ প্রদীপে মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনী থাকলেও পর্দার অন্তরালে কলকাঠি নাড়ছে ইহুদী-খৃষ্টান নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ করপোরেট হাউজগুলি। আফ্রিকা ও আরব দেশগুলি সহ মুসলিম বিশ্বের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ লুট ও বিশাল বাজার দখলের অভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সর্বত্র গণতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। একাজে তারা ধর্মকেও ব্যবহার করছে। পূর্ব তিমুরে ধর্ম প্রচারের নামে তাদের খৃষ্টান বানিয়ে তাদেরকে ইন্দোনেশিয়া থেকে পৃথক করে কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়ে পুতুল সরকারের মাধ্যমে সেখানকার সাগর তীরে বসে জাহাযের পর

জাহায ভরে তেল লুটে নিয়ে যাচ্ছে তারা। মুখোশ খুলে যাওয়ায় পূর্ব তিমুরের বুভুক্ষ মানুষ এখন আবার ইন্দোনেশিয়ার দিকে ঝুঁকছে। অতি সম্প্রতি দক্ষিণ সূদানকে পৃথক করা হয়েছে, খৃষ্টান অধ্যুষিত দক্ষিণ এলাকার তেল লুট করার জন্য। লিবিয়ায় একদল গাদ্দাফী বিরোধীকে দিয়ে অস্থায়ী সরকার কায়েম করে তাদের কথিত অনুমতি নিয়ে তেল লুট করা শুরু হয়েছে। ইরাক ও আফগানিস্তানের পর ওরা এবার পাকিস্তানকে পুরোপুরি কব্জায় নেবে। তালেবান দমন ও পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনার নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সেদেশে মার্কিন সামরিক আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব কায়েমের পথ খোলাছা করা হচ্ছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের তাই এখন বাঁচা-মরা সমস্যা।

ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সূদান, মিসর, লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়ামেন, বাহরায়েন-এর ন্যায় বাংলাদেশও মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এদেশের শতকরা ৯০ জন নাগরিক মুসলমান। এদেশটির উদ্ভাবিত ও নিরুপিত প্রাকৃতিক সম্পদের চাইতে অনুদ্ভাবিত প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার বেশী সমৃদ্ধ। বলা হয়ে থাকে যে, পুরো বাংলাদেশ তেলের উপর ভাসছে। যা উত্তোলন করা গেলে এদেশের মাথাপিছু আয় আমেরিকার বর্তমান মাথাপিছু আয়ের চাইতে একশ' গুণেরও বেশী দাঁড়িয়ে যাবে। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য সম্পদ। উপরন্তু দেশটির রয়েছে নিজস্ব দু'টি সামুদ্রিক বন্দর। রয়েছে ১৬ কোটি মানুষের বিশাল আভ্যন্তরীণ বাজার। এর ভৌগলিক অবস্থান সামরিক কৌশলগত দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছু বিবেচনায় নিলে এদেশটি পার্শ্ববর্তী আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হামলার এবং বিদেশী করপোরেট শক্তির আগ্রাসী থাবায় আক্রান্ত হওয়ার শতভাগ আশংকা রয়েছে। ইতিমধ্যে উজানে সব নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশটিকে মরুভূমি বানানোর চক্রান্ত সফল হয়েছে। আমাদের প্রায় এক কোটি মানুষ এখন বিদেশে শ্রম বিক্রি করছে। অথচ নিজ দেশের সম্পদের ভাণ্ডার অন্যেরা শুষে নিচ্ছে। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি প্রভৃতি আন্ত র্জাতিক করপোরেট হাউজ তথা শোষক সংস্থাগুলি কখনোই চায় না বাংলাদেশ নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। তারা চায় এদেশটি সর্বদা তাদের কাছ থেকে চক্রবৃদ্ধি হারের সূদে নেওয়া ঋণের জালে আবদ্ধ থাকুক। আর তাই তাদের ইঙ্গিতে ইঙ্গ-মার্কিন পরাশক্তি একদিকে যেমন এদেশের নেতৃত্বকে পরস্পরে বিভক্ত ও মারমুখী করে রেখেছে, অন্যদিকে তেমনি দেশটিকে জঙ্গীরাষ্ট্র বানানোর সকল চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। এক্ষণে তারা কথিত জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে এদেশে ঘাঁটি গাড়বে এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মতই দুরবস্থার সৃষ্টি করবে।

পরিশেষে বলব, দেশ, জাতি ও মানবতার স্বার্থে ওসামারা চিরকাল জীবন দেয়। আর তাদের অমলিন ত্যাগ ও তেজোদ্দীপ্ত ঈমানকে ওবামারা চিরদিন ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে। অতঃপর ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত তাদের ফেলে দেয় ডাষ্টবিনে। ওসামারা তাই মযলূম মানবতার প্রেরণার উৎস। আর ওবামারা হ'লেন যুলুমের প্রেতাত্মা। ওসামারা মরেও অমর। কিন্তু ওবামারা বেঁচে থেকেও মৃত। বাংলাদেশী নেতারা তাই সাবধান হও। আধিপত্যবাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণনীতি ছাড়। এক বন্ধু গেলেও শত বন্ধু তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। অতএব আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে দৃঢ় ঈমান নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও। মনে রেখ আল্লাহ্র শক্তির সামনে মানুষের শক্তি কিছুই নয়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! *(স.স.)*।

(২) হকিং-এর পরকাল তত্ত্ব

আপেক্ষিকতা সূত্রের (Law of Relativity) উদ্গাতা জন আইনস্টাইনের পর অনেকের নিকট বর্তমান বিশ্বের সেরা পদার্থ বিজ্ঞানী ড. স্টিফেন হকিং (জন্ম : লণ্ডন, ১৯৪২), যিনি মধ্যাকর্ষণ শক্তির উদ্ভাবক স্যার আইজাক নিউটনের ন্যায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'লুকাসিয়ান অধ্যাপক'-এর বিরল সম্মাননায় ভূষিত, তিনি স্বীয় গবেষণা বিষয়বস্তু তথা ফিজিক্স-এর বাইরে গিয়ে মেটাফিজিক্স বা থিওলজি সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে সম্প্রতি এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা তাঁর সুউচ্চ সম্মানকে কালিমালিপ্ত করেছে। বৃটেনের প্রভাবশালী দৈনিক গার্ডিয়ানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে 'পরকাল' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই। স্বর্গ ও নরক মানুষের অলীক কল্পনা মাত্র'। এর আগেও গত বছর তিনি 'স্রষ্টার অস্তিত্ব ও মহাবিশ্বের শৃংখলা' নিয়ে তার বই 'দি গ্রাণ্ড ডিজাইনে' অনেক ঔদ্ধত্যপূর্ণ কটাক্ষ করেন। সেখানে তিনি দাবী করেন যে, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বর ধারণার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি সৃষ্টিকর্তাকে 'মানব কল্পিত রূপক' হিসাবে বর্ণনা করেন। হকিং-এর এসব মন্তব্য স্রেফ কল্পনা নির্ভর হ'লেও যেহেতু তারা বিজ্ঞানী, অতএব তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন বহু মানুষ। বিশেষ করে দুর্বল বিশ্বাসী, কপট বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ এইসব মন্তব্যগুলিকে তাদের পক্ষে বড় দলীল হিসাবে সোৎসাহে পেশ করে থাকেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যথাক্রমে শিল্পবিপ্লব ও বিজ্ঞানের নানামুখী আবিষ্কারে হতচকিত হয়ে সাময়িকভাবে অনেক বিজ্ঞানী বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা বিশ্ব চরাচরের সবকিছুকে 'প্রকৃতির লীলাখেলা' মনে

করতেন। কিন্তু এখন তাদের অধিকাংশের হুঁশ ফিরেছে এবং হোয়াইট হেড, আর্থার এডিংটন, জেম্‌স জীন্‌স (১৮৭৭-১৯৪৬) সহ বিরাট সংখ্যক বিজ্ঞানী স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, Nature is alive 'প্রকৃতি এক জীবন্ত সত্তা'। কেবল জীবন্ত নয়, বরং ডব্লিউ,এন, সুলিভানের ভাষায় বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের সার নির্যাস হ'ল, The ultimate nature of the universe is mental. 'বিশ্বলোকের চূড়ান্ত প্রকৃতি হ'ল মানসিক'। অর্থাৎ সৌরজগত আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি বা এটা কোন বিগব্যাং বা মহা বিস্ফোরণের ফসল নয় বা অন্ধ-বোবা-বধির কোন ন্যাচার বা প্রকৃতি নয়, বরং একজন প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তার মহা পরিকল্পনার ফসল। আর তিনিই হচ্ছেন 'আল্লাহ'। যিনি বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। যাঁর পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনায় সবকিছু চলছে *(ইউনুস ১০/৩১)*। হাঁ, বিগব্যাং যদি হয়ে থাকে, তবে সেটা দুনিয়ার মানুষ বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বে নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মুখ দিয়ে শুনেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'যারা অবিশ্বাস করে তারা কি দেখে না যে, আকাশ সমূহ ও পৃথিবী পূর্বে মিলিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম। অতঃপর প্রাণবান সবকিছুকে আমরা সৃষ্টি করলাম পানি হ'তে। তবুও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না'? *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। অতঃপর পরকাল কেন? কেন মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে? আল্লাহ বলেন, ...নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। যাতে তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের যথাযথ পুরস্কার দিতে পারেন। আর যারা অবিশ্বাস করে তারা প্রাপ্ত হবে উত্তপ্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের অবিশ্বাসের প্রতিফল স্বরূপ' *(ইউনুস ১০/৪)*। আল্লাহ বলেন, তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর এটি তার জন্য অধিকতর সহজ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(রূম ৩০/২৭)*। অদৃশ্য জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানীদের নেই। তাই তাদের জ্ঞান অপূর্ণ। সেকারণেই বিজ্ঞানী আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) বলেছেন, Religion without science is blind and Science without religion is lame. 'বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ এবং ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান পঙ্গু।'

আজকের হকিংদের ন্যায় সেকালে মক্কার মুশরিক নেতাদের অনেকের ধারণা ছিল যে, মানুষ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই তারা ধ্বংস হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তারা বলে যে, পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি। আর আমাদের কেউ ধ্বংস করে না কাল ব্যতীত। বস্তুতঃ এব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণা করে মাত্র' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৪)*। আরব নেতারা বলেছিল, 'যখন আমরা মরব ও মাটি হয়ে যাব (অতঃপর পুনরুজ্জীবিত হব), সেই প্রত্যাবর্তন তো সুদূর পরাহত' *(ক্বাফ ৫০/৩)*। এ নিয়ে তারা ঝগড়ায় লিপ্ত ছিল। আল্লাহ বলেন, 'ওরা কি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? মহা সংবাদ নিয়ে? 'যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত'। 'কখনোই না (তাদের ধারণা অবাস্তব)। 'শীঘ্র তারা জানতে পারবে'। 'আবার বলছি, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে' *(নাবা ৭৮/১-৫)*। কি সে মহা সংবাদ? সেটি হ'ল পুনর্জন্মের সংবাদ। কেননা মানবজীবনে সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হ'ল জন্মগ্রহণ করা। আর সবচেয়ে দুঃসংবাদ হ'ল মৃত্যুবরণ করা বা বিলীন হয়ে যাওয়া। এ দুনিয়াতে কেউ মরতে চায় না। কিন্তু যে মানুষের জন্য আসমান-যমীন সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে, সেই মানুষ গড়ে একশ' বছরের মধ্যেই মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ ইহজীবনে তার আশা-আকাংখার অনেক কিছুই পূরণ হচ্ছে না। তাই এই অস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ জগত থেকে চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ আরেকটি জগতে হিজরত করতে হয়। যেখানে যালেম তার সমুচিত শাস্তি পাবে এবং মযলূম তার যথাযথ পুরস্কার পেয়ে তৃপ্ত হবে। আর সে জগতটাই হ'ল পরজগত। মৃত্যুর পরেই হবে যার শুরু এবং ক্বিয়ামতের দিন হবে যার পূর্ণতা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ভয় কর সেই দিনের, যেদিন তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আল্লাহ্‌র দিকে। অতঃপর প্রত্যেকে প্রতিফল পাবে, যা কিছু সে অর্জন করেছিল (দুনিয়াতে)। আর তারা মোটেই অত্যাচারিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। আর এটাই হ'ল জগদ্বাসীর প্রতি আল্লাহ্‌র সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত। অতএব যদি পরকাল বিশ্বাস না থাকত, তাহ'লে সবল ও দুর্বলের হানাহানিতে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ত। অবিশ্বাসীদের সন্দেহ দূর করার জন্যই আল্লাহ স্বীয় নবীকে মে'রাজে নিয়ে জান্নাত-জাহান্নাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। এরপরেও কি হকিংদের চোখ খুলবে না। হে বিজ্ঞানী স্টিফেন! কোন সে শক্তি যিনি আপনাকে ১৯৬৩ সাল থেকে বিগত ৪৮ বছর যাবত মাথা ব্যতীত পুরা দেহ প্যারালাইসিসে পঙ্গু করে রেখেছেন? দুনিয়ার সকল চিকিৎসা সুবিধা নাগালের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি সুস্থ হ'তে পারছেন না? আপনার বুকের মধ্যের রূহটা কি কখনো দেখতে পেয়েছেন? ওটা কার হুকুমে এসেছে, আর কার হুকুমে চলে যাবে? আপনি কি ১৯৮৬ সালে শিকাগো শহরে আগের বছরের দেয়া তত্ত্বের ভুল স্বীকার করেননি? বিজ্ঞান স্রেফ অনুমিতি নির্ভর বস্তু নয় কি? অথচ 'আল্লাহ্‌র কালাম সত্য ও ন্যায় দ্বারা পরিপূর্ণ..' *(আন'আম ৬/১১৫)*। ঐ শুনুন আপনার সৃষ্টিকর্তার বাণী, 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনিই সকল কিছু পরিচালনা করেন... *(ইউনুস*

১০/৩)। অতএব তওবা করুন! মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করুন!! পরকালে ভাল থাকবেন ইনশাআল্লাহ। *(স.স.)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/১২ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

ওহোদ যুদ্ধ

(৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার)

বদর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়, 'সাভীক্ব' যুদ্ধে ছাতুর বস্তাসহ অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম ফেলে আবু সুফিয়ানের জান নিয়ে পালিয়ে আসার গ্লানিকর তিক্ত অভিজ্ঞতা ও সবশেষে ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার নেতৃত্বে মদীনার পথ ছেড়ে নাজদের পথ ধরে সিরিয়া যাত্রী কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা মুসলিম বাহিনী কর্তৃক লুট হওয়া এবং দলনেতা ছাফওয়ানের কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার লজ্জাষ্কর পরিণতির প্রেক্ষাপটে কুরায়েশ নেতারা মুসলমানদের সাথে কালবিলম্ব না করে একটা চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সঙ্গত কারণেই এ ব্যাপারে বদর যুদ্ধে নিহত নেতা আবু জাহলের পুত্র ইকরিমা, উৎবাহ্র ভাই আব্দল্লাহ ও সাভীক যুদ্ধে পালিয়ে আসা আবু সুফিয়ান এবং সর্বশেষ বাণিজ্য কাফেলা ফেলে পালিয়ে আসা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

যুদ্ধের পুঁজি : বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে বিবেচিত কুরাইশের যে বাণিজ্য কাফেলা আবু সুফিয়ান স্বীয় বুদ্ধিবলে মুসলিম বাহিনীর কবল থেকে বাঁচিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলের, সেই বাণিজ্য সম্ভারের সবটুকুই মালের মালিকদের সম্মতিক্রমে ওহোদ যুদ্ধের পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়। যার বিক্রয়লব্ধ মাল ও অর্থের পরিমাণ ছিল ১,০০০ উট ও ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা। এ প্রসঙ্গে সূরা আনফাল ৩৬ আয়াতটি নাযিল হয়। যাতে বলা হয়, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ– আল্লাহ্র রাস্তা হ'তে লোকদের ফিরানোর জন্য কাফেররা যত ধনসম্পদ ব্যয় করুক না কেন, সবই ওদের মনস্তাপের কারণ হবে। ওরা পরাভূত হবে। অতঃপর কাফেররা জাহান্নামে একত্রিত হবে' *(আনফাল ৮/৩৬)*।

মাক্কীদের যুদ্ধ প্রস্তুতি : মুসলিম শক্তিকে সমূলে উৎখাত করার জন্য তারা সাধারণ গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক বেদুঈন, কেনানা ও তেহামার অধিবাসীদের মধ্যকার যেকোন ব্যক্তি যেন এই যুদ্ধে কুরায়েশ বাহিনীতে শরীক হয়। লোকদের উত্তেজিত ও উৎসাহিত করার জন্য দু'জন কবি আবু 'ইযযা (أبو عــزة) এবং মুসাফে' বিন আবদে মানাফ আল-জুমাহী (مُسافع بن عبد مناف الْجُمَحي)-কে কাজে লাগানো হয়। প্রথমজন বদরযুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। পরে রাসূলের বিরোধিতা করবে না, এই শর্তে কোনরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি লাভ করে। তাকে গোত্রনেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরে আসলে তাকে ধনবান করে দেবেন। অন্যথায় তার কন্যাদের লালন-পালনের দায়িত্ব নেবেন'। উক্ত দুই কবি অর্থ-সম্পদের লোভে সর্বত্র যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আসতেই মক্কায় তিন হাযার সুসজ্জিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দার নেতৃত্বে ১৫ জন মহিলাকেও সঙ্গে নেওয়া হ'ল, যাতে তাদের দেওয়া উৎসাহে সৈন্যরা অধিক উৎসাহিত হয় এবং তাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে সৈন্যরা জীবনপণ লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ হয়। অতঃপর যুদ্ধ সম্ভারের মধ্যে ছিল বাহন হিসাবে ৩০০০ উট, ২০০ যুদ্ধাশ্ব এবং ৭০০ লৌহবর্ম। খালেদ ইবনু ওয়ালীদ ও ইকরিমা বিন আবু জাহলকে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক করা হয়। আবু সুফিয়ান হ'লেন পুরা বাহিনীর অধিনায়ক এবং যুদ্ধের পতাকা অর্পণ করা হয় প্রথা অনুযায়ী বনু আব্দিদ্দার গোত্রের হাতে।

মদীনায় সংবাদ প্রাপ্তি :

কুরায়েশ নেতাদের এই ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর রাসূলের চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (যিনি তখনো প্রকাশ্যে মুসলমান হননি) একজন বিশ্বস্ত পত্রবাহকের মাধ্যমে দ্রুত মদীনায় পাঠিয়ে দেন এবং তাতে তিনি সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে দেন। ৫০০ কিলোমিটার রাস্তা মাত্র তিনদিনে অতিক্রম করে পত্রবাহক সরাসরি গিয়ে রাসূলের হাতে পত্রটি পৌঁছে দেয়। তিনি তখন ক্বোবায় অবস্থান করছিলেন। হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) পত্রটি রাসূল (ছাঃ)-কে পাঠ করে শুনান। তিনি কা'বকে পত্র প্রাপ্তির বিষয়টি গোপন রাখতে বলেন ও দ্রুত মদীনায় এসে মুহাজির ও আনছার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ বৈঠকে বসেন। অন্যদিকে মদীনার চারপাশে পাহারা দাঁড় করানো হ'ল। স্বয়ং রাসূলের দ্বাররক্ষী হিসাবে রাত্রি জেগে পাহারা দেবার জন্য আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয, খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ এবং উসায়েদ বিন হুযায়ের প্রমুখ

আনছার নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে নিয়োজিত করলেন। চারদিকে গোয়েন্দা প্রেরণ করা হ'ল মাক্কী বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর নেওয়ার জন্য। গোয়েন্দাগণ মুহূর্তে মুহূর্তে রাসূলের নিকটে তাদের খবর পৌঁছে দিতে থাকেন।

পরামর্শ বৈঠকের বিবরণ : মুহাজির ও আনছার নেতৃবৃন্দের উক্ত পরামর্শ বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে নিজের দেখা একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, إني قد رأيت والله خيرًا، 'আল্লাহ্র কসম! আমি একটি ভাল স্বপ্ন দেখেছি'। আমি দেখি যে, কতগুলি গরু যবেহ করা হচ্ছে। দেখি যে, আমার তরবারির মাথায় কিছুটা ভগ্নদশা। আরো দেখি যে, আমার হাতখানা একটি সুরক্ষিত বর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছি'। এর ব্যাখ্যা এই হ'তে পারে যে, আমার কিছু ছাহাবী এ যুদ্ধে নিহত হবে। তরবারির মাথা ভাঙ্গার অর্থ আমার পরিবারের কেউ নিহত হবেন। আর সুরক্ষিত বর্ম অর্থ মদীনা সুরক্ষিত থাকবে।

অতঃপর যুদ্ধ কৌশল হিসাবে তিনি প্রথমে নিজের মত প্রকাশ করে বলেন, নগরীর অভ্যন্তরে থেকেই যুদ্ধ করা সমীচীন হবে। কেননা চারদিকে পাহাড় বেষ্টিত হওয়ার কারণে আমরা সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে আছি (إنا في جُنَّة حصينة)। খাযরাজ গোত্রের অন্যতম প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ বিন উবাই (মুনাফিক সর্দার) সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের এ মত সমর্থন করলেন। তিনি যুক্তি দিলেন যে, এতে আমাদের পুরুষেরা তাদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করবে এবং আমাদের মেয়েরা ও বালকেরা বাড়ীর ছাদের উপর থেকে ওদেরকে পাথর ছুঁড়ে মারবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি মদীনাতেই থাকুন। বের হবেন না। আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনোই শত্রুদের দিকে বের হব না। তাহ'লে তারা আমাদের কাবু করে ফেলবে'।[১] এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ না করা এবং শত্রুদের জিতিয়ে দেওয়া। অথচ কেউ যেন সেটা বুঝতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া এবং সর্বসমক্ষে তাদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাওয়া।

এতে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, কপট সাথীরা সর্বদা নেতার মতের সাথে জী হুযুর বলে থাকে। পক্ষান্তরে নেতার শুভাকাংখীরা সর্বদা সতর্কভাবে নেতাকে সুপরামর্শ দেয়। তাতে তাদের নিজেদের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও তারা নেতা ও সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

অতঃপর উপরোক্ত প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত তলব করলে একদল বুযর্গ ছাহাবী (جماعة من فضلاء الصحابة), বিশেষ করে যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাঁরা দ্রুত বলে উঠলেন, হে রাসূল! আমরা তো এদিনের অপেক্ষাতেই ছিলাম এবং আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করছিলাম। আজ সেটা আমাদের কাছে এসে গেছে এবং অতীব নিকটবর্তী হয়েছে। অতএব اخرُج إلى أعدائنا، لا يرون أنَّا جَبُنَّا عنهم وضَعُفنا– 'আপনি শত্রুদের দিকে বের হউন। যাতে তারা আমাদেরকে কাপুরুষ ও দুর্বল বলে ধারণা করতে না পারে'। রাসূলের চাচা হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব, যিনি বদর যুদ্ধে নিজের তরবারির চমক দেখিয়েছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, والذى أنزل عليك الكتاب لا اطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة 'সেই সত্তার কসম! যিনি আপনার উপরে কিতাব নাযিল করেছেন। আমি খাদ্য গ্রহণ করব না, যতক্ষণ না আমি মদীনার বাইরে গিয়ে আমার তরবারি দ্বারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব'। আনছারদের বাকী প্রায় সবাই বললেন, আমরা জাহেলী যুগে বাইরে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করতাম। এখন ইসলামী যুগে আমরা বাইরে গিয়ে মুকাবিলার অধিক হকদার। অতএব শত্রুদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ুন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাঁর পূর্বমত পরিবর্তন করলেন এবং অধিকাংশের মত অনুযায়ী (رأي الأغلبية) মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। অতঃপর একটি জানাযা শেষে পোষাক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এতে ছাহাবীগণ লজ্জিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনাকে বাধ্য করতে চাই না। আপনি চাইলে মদীনাতে থেকেই যুদ্ধ করুন। কিন্তু তিনি বললেন, কোন নবীর জন্য এটা সঙ্গত নয় যে, যুদ্ধের পোষাক পরিধানের পর তা খুলে ফেলেন'। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৈষয়িক ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অধিকাংশের রায় মেনে নেওয়া আমীরের জন্য সঙ্গত। এর পরেও তাঁকে বাধ্য করা যাবে না। বরং তাঁর সিদ্ধান্ত সকলকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। তবে বিধানগত বিষয়ে অধিকাংশের রায় মেনে নেওয়া বৈধ নয়' *(আন'আম ১১৫-১১৬)*।

মাক্কী বাহিনীর অবস্থান ও শ্রেণীবিন্যাস :

মাক্কী বাহিনী মহা সমারোহে বিনা বাধায় বুক ফুলিয়ে এসে মদীনার দ্বারপ্রান্তে ওহোদ পাহাড়ের সন্নিকটে মদীনার উত্তরে 'আয়নায়েন' (عينين) নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করে। আসার পথে মদীনার উপকণ্ঠে 'আবওয়া' (الأبواء) নামক স্থানে পৌঁছলে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ রাসূলের আম্মা বিবি আমেনার কবর উৎপাটন করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বাহিনীর নেতৃবৃন্দ তার এ প্রস্তাব

১. *ইবনু হিশাম ২/৬৩।*

প্রত্যাখ্যান করেন এর ভয়ংকর পরিণতির কথা চিন্তা করে। এভাবে মাক্কী বাহিনী মদীনায় পৌঁছে যায় ৩য় হিজরীর ৬ই শাওয়াল শুক্রবার তারিখে। তাদের ডান বাহুর অধিনায়ক ছিলেন খালেদ ইবনু ওয়ালীদ এবং বাম বাহুর অধিনায়ক ছিলেন ইকরিমা বিন আবু জাহল। তীরন্দায বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু রাবী'আহ এবং পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ছাফওয়ান ইবনু উমাইয়া। আবু সুফিয়ান ছিলেন সর্বাধিনায়ক এবং তিনি মধ্যভাগে অবস্থান নেন।

ইসলামী বাহিনীর বিন্যাস ও অগ্রযাত্রা :

দক্ষ গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে মাক্কী বাহিনীর যাবতীয় খবর রাসূলের নিকটে পৌঁছে যায়। তিনি তাদেরকে বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে ত্বরিৎ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ৬ই শাওয়াল শুক্রবার বাদ আছর রওয়ানা করেন। ইতিপূর্বে তিনি জুম'আর খুৎবায় লোকদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়তার উপদেশ দেন এবং তার বিনিময়ে জান্নাত লাভের সুসংবাদ শুনান। অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে তিনি মদীনার দায়িত্বে রেখে যান, যাতে তিনি মসজিদে ছালাতের ইমামতি করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর এক হাযার ফৌজকে মুহাজির, আউস ও খাযরাজ- তিন বাহিনীতে ভাগ করেন। ঐ দিন যুদ্ধের পতাকা ছিল কালো রংয়ের। তিনি মুহাজির বাহিনীর পতাকা দেন মুছ'আব বিন ওমায়ের-এর হাতে। তিনি শহীদ হবার পর দেন আলী (রাঃ)-এর হাতে। আউসদের পতাকা দেন উসায়েদ বিন হুযায়ের-এর হাতে এবং খাযরাজদের পতাকা দেন হাবাব ইবনুল মুনযির-এর হাতে। এক হাযারের মধ্যে ১০০ ছিলেন বর্ম পরিহিত। রাসূল (ছাঃ) উপরে ও নীচে দু'টি লৌহবর্ম পরিধান করেন। অশ্বারোহী কেউ ছিলেন কি-না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

আল্লাহ তাঁকে শত্রু থেকে রক্ষা করবেন *(মায়েদাহ ৬৭)* এটা জেনেও তিনি এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন স্বীয় উম্মতকে এটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, সকল কাজে দুনিয়াবী রক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করতে হবে।

মদীনা থেকে বাদ আছর আউস ও খাযরাজ নেতা দুই সা'দকে সামনে নিয়ে রওয়ানা দিয়ে 'শায়খান' (الشيخان) নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় সেনাবাহিনী পরিদর্শন করেন। বয়সে কম ও অনুপযুক্ত বিবেচনা করে তিনি দশজনকে বাদ দেন। এরা ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন ওমর, উসামাহ বিন যায়েদ, উসায়েদ বিন যুহায়ের, (أسيد بن ظهير) যায়েদ বিন ছাবেত, যায়েদ বিন আরক্বাম, আরাবাহ বিন আউস (عرابة بن اوس), আমর ইবনু হাযম, আবু সাঈদ খুদরী, যায়েদ বিন হারেছাহ আনছারী এবং সা'দ ইবনু হিব্বাহ (سعد بن حبة)। ১৫ বছর বয়স উত্তীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও রাফে' বিন খাদীজ এবং সামুরাহ বিন জুনদুবকে নেওয়া হয়। এর কারণ ছিল এই যে, দক্ষ তীরন্দায হিসাবে রাফে' বিন খাদীজকে নিলে সামুরাহ বলে উঠে যে, আমি রাফে' অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। আমি তাকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সুযোগ দিলে সত্য সত্যই তিনি কুস্তিতে জিতে যান। ফলে দু'জনেই যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি পান।[২] এর মাধ্যমে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ পরিমাপ করা যায় এবং এটাও প্রমাণিত হয় যে, জিহাদের জন্য কেবল আকাংখাই যথেষ্ট নয়, বরং দৈহিক শক্তি এবং আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি আবশ্যক।

ইতিপূর্বে ছানিয়াতুল বিদা' (ثنية الوداع) পৌঁছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত একটি বাহিনী দেখতে পেয়ে তাদের সম্পর্কে জানতে চান। সাথীরা বললেন যে, ওরা আমাদের পক্ষে যুদ্ধে যাবার জন্য বেরিয়েছে। ওরা খাযরাজ গোত্রের মিত্র বনু ক্বায়নুক্বার ইহুদী। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য নিতে অস্বীকার করলেন (فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك)। এখানে কুরায়েশকে মুশরিক এবং ইহুদীদেরকে তিনি 'কাফের' বলে অভিহিত করেন। অবশ্য কুরআনে কুরায়েশ দলকে 'কাফির' বলা হয়েছে' *(আনফাল ৩৬)*। মূলতঃ শেষনবীকে অস্বীকার করায় দু'টি দলই কাফের। আর পরিণতির দিক দিয়ে কাফির ও মুশরিক সমান।

শায়খানে সন্ধ্যা নেমে আসায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেখানেই রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেন। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্র নেতৃত্বে পঞ্চাশ জনকে পাহারায় রেখে বাকী সবাই ঘুমিয়ে যান। শেষ রাতে ফজরের কিছু পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাহিনীসহ আবার চলতে শুরু করেন এবং শাওত্ব (الشوط) নামক স্থানে পৌঁছে ফজর ছালাত আদায় করেন। এখান থেকে মাক্কী বাহিনীকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বিশাল কুরায়েশ বাহিনী দেখে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ৩০০ জনকে অর্থাৎ প্রায় এক তৃতীয়াংশ সেনা দলকে ফিরিয়ে নিয়ে এই কথা বলতে বলতে চলে গেল যে, مـا ندري علام نقتل أنفسنا 'জানি না আমরা কিসের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে যাচ্ছি'? তারপর সে এ যুক্তি পেশ

২. *ইবনু হিশাম ২/৬৬।*

করল যে, إن الرسول صلى الله عليه وسلم تـــرك رأيـــه وأطاع غيره– 'রাসূল (ছাঃ) তার কথা পরিত্যাগ করেছেন ও অন্যদের কথা মেনে নিয়েছেন'। অর্থাৎ তিনি আমাদের মূল্যায়ন করেননি। অথচ এখানে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীতে ফাটল সৃষ্টি করা, যাতে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মক্কার আগ্রাসী বিশাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীরা ধ্বংস হয়ে যায়। তাতে তার নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী খতম হয়ে যাবে ও তার জন্য পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইসলামী সংগঠনে ফাটল সৃষ্টিকারী মুনাফিক ও সুবিধাবাদী নেতাদের চরিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার দলের পশ্চাদপসারণ দেখে আউস গোত্রের মধ্যে বনু হারিছাহ এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বনু সালামারও পদস্খলন ঘটবার উপক্রম হয়েছিল এবং তারাও মদীনায় ফিরে যাবার চিন্তা করছিল। কিন্তু আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে তাদের চিত্ত চাঞ্চল্য দূরীভূত হয় এবং তারা যুদ্ধের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়। এ দু'টি দলের প্রতি ইঙ্গিত করেই সূরা আলে ইমরান ১২২ আয়াত নাযিল হয়, إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُـــوْنَ– 'যখন তোমাদের মধ্যকার দু'টি দল সাহস হারাবার উপক্রম করেছিল, অথচ আল্লাহ ছিলেন তাদের অভিভাবক। অতএব আল্লাহ্র উপরেই যেন বিশ্বাসীগণ নির্ভর করে' *(আলে ইমরান ৩/১২২)*। এ সময় মুনাফিকদের ফিরানোর জন্য হযরত জাবিরের পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম তাদের পিছে পিছে চলতে থাকেন ও বলতে থাকেন যে, تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعـــوا– 'এসো আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর'। কিন্তু তারা বলল, لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجـــع 'যদি আমরা জানতাম যে, তোমরা প্রকৃতই যুদ্ধ করবে, তাহ'লে আমরা ফিরে যেতাম না'। একথা শুনে আব্দুল্লাহ তাদের বলেন, أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عـــنكم نبيـــه– 'দূর হ আল্লাহ্র শত্রুরা। সত্বর আল্লাহ তাঁর নবীকে তোদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করবেন'। এ প্রসঙ্গেই সূরা আলে ইমরান ১৬৬-৬৭ আয়াত নাযিল হয় যেখানে বলা হয়, وَلِـــيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُواْ، 'এর দ্বারা তিনি মুমিনদের বাস্তবে জেনে নেন' 'এবং মুনাফিকদেরও জেনে নেন' *(আলে ইমরান ৩/১৬৬-৬৭)*। অর্থাৎ মুনাফিকদের উক্ত জওয়াব ছিল কেবল মুখের। ওটা তাদের অন্তরের কথা ছিল না। এভাবেই আল্লাহ মুসলিম সেনাদলকে ইহুদী ও মুনাফিক থেকে মুক্ত করে নেন এবং অবশিষ্ট প্রায় ৭০০ সেনাদল নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ওহোদের দিকে অগ্রসর হন। এ সময় এক অন্ধ মুনাফিক মারবা' ইবনু ক্বাইযী (مربع بـــن قيظـــي)-এর বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে গেলে সে মুসলিম বাহিনীর মুখের দিকে ধূলো ছুঁড়ে মেরে রাসূলের উদ্দেশ্যে বলে, তুমি যদি সত্যিকারের রাসূল হও, তবে তোমার জন্য আমার এ বাগানে প্রবেশ করার অনুমতি নেই'। মুসলিম সেনারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাদের নিষেধ করে বলেন, ওকে হত্যা করো না। هذا أعمى القلب و أعمى البصر 'সে অন্তরেও অন্ধ, চোখেও অন্ধ'।

এখানে দু'টো জিনিষ বুঝা যায় যে, ইসলামী জিহাদের প্রয়োজনে যেকোন জনপদ অতিক্রম করা যায়। এজন্য কারু অনুমতির প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়তঃ কাউকে হত্যা করা যাবে না। যতক্ষণ না সে অস্ত্র ধারণ করে হত্যায় উদ্যত হয়।

ইসলামী বাহিনীর শিবির সন্নিবেশ ও শ্রেণীবিন্যাস :

অতঃপর অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করেন ও সেখানে শিবির স্থাপন করেন। শত্রু সেনারা যাতে পিছন দিক হ'তে হামলা করতে না পারে, সেজন্য তিনি পূর্ব-দক্ষিণের সংকীর্ণ ও স্বল্পোচ্চ গিরিপথে আউস গোত্রের বদরী ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের আনছারীর নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দায দলকে নিযুক্ত করেন। যে স্থানটি এখন 'জাবালুর রুমাত' (جبـــل الرمـــاة) বা তীরন্দাযদের পাহাড় বলে পরিচিত। তাদেরকে বলে দেওয়া হয় যে, জয় বা পরাজয় যাই-ই হৌক না কেন, তারা যেন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান পরিত্যাগ না করে এবং শত্রুপক্ষ যেন কোনভাবেই এপথ দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে। এমনকি আমাদের মৃত লাশে যদি পক্ষীকূল ছোঁ মারতে থাকে, তথাপি তোমরা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করবে না। অথবা আমরা বিজয়ী হয়ে যদি গণীমত কুড়াতে থাকি, তথাপি তোমরা তাতে শরীক হবে না'। فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم 'অতএব তোমরা হটবে না, যতক্ষণ না আমরা তোমাদের ডেকে পাঠাই'।[৩] কেননা শত্রুপক্ষ পরাজিত হ'লে কেবলমাত্র এপথেই তাদের পুনরায় হামলা করার আশংকা ছিল। দূরদর্শী সেনাপতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটা বুঝতে পেরেই তাদেরকে এমন কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান করেন। তিনি পাহাড়কে আড়াল করে পিছন ও দক্ষিণ বাহুকে নিরাপদ করেন। আর যে গিরিপথ দিয়ে শত্রুপক্ষের প্রবেশের আশংকা ছিল, সেপথটি

৩. *বুখারী, 'জিহাদ' অধ্যায় ১/৪২৬, হা/৩০৩৯; ফাৎহুল বারী ৭/৪০৩।*

তীরন্দাযদের মাধ্যমে সুরক্ষিত করে নেন। আর শিবির স্থাপনের জন্য একটি উঁচু জায়গা নির্বাচন করেন। যাতে পরাজিত হ'লেও শত্রুপক্ষ সেখানে পৌঁছতে না পারে এবং তেমন কোন ক্ষতি করতে না পারে। এভাবে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে তিনি শিবির সন্নিবেশ করেন। অতঃপর তিনি মুনযির বিন 'আমরকে ডান পার্শ্বের এবং যুবায়ের ইবনুল 'আওয়ামকে বাম পার্শ্বের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদকে তার সহকারী নিয়োগ করেন। বাম বাহুর প্রধান দায়িত্ব ছিল কুরায়েশ অশ্বারোহী বাহিনী ও তাদের অধিনায়ক খালেদ বিন ওয়ালীদকে ঠেকানো। তিনি বড় বড় যোদ্ধাগণকে সম্মুখ বাহিনীতে রাখেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নয়জন দেহরক্ষী নিয়ে পিছনে অবস্থান নেন ও যুদ্ধ পরিস্থিতি অবলোকন করতে থাকেন।

কুরায়েশদের রাজনৈতিক চাল :

(১) যুদ্ধ শুরুর কিছু পূর্বে আবু সুফিয়ান আনছারদের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান যে, তোমরা আমাদের ও আমাদের স্বগোত্রীয়দের মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াও। আমরা তোমাদের থেকে সরে আসব। তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই'। কিন্তু আনছারগণ তাদের কূটচাল বুঝতে পেরে ভীষণভাবে তিরষ্কার করে বিদায় করলেন।

(২) প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কুরায়েশ পক্ষ দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণ করল। ইসলামের পূর্বে আউস গোত্রের অন্যতম নেতা ও পুরোহিত ছিল 'আবু আমের' আর-রাহিব। আউস গোত্র ইসলাম কবুল করলে সে মক্কায় চলে যায় এবং কুরায়েশদের সঙ্গে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তার ধারণা ছিল যে, সে ময়দানে উপস্থিত হ'লে আনছাররা ফিরে যাবে। সেমতে সে ময়দানে এসে আনছারদের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়ে তাদেরকে ফিরে যেতে বলে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হ'ল না। সংখ্যার আধিক্য ও সরঞ্জামের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের ব্যাপারে কুরায়েশরা কিরূপ ভীত ছিল, উপরোক্ত ঘটনায় তা কিছুটা আঁচ করা যায়।

উল্লেখ্য যে, রাসূলের মদীনায় হিজরতের দিন থেকে হুনায়েন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে আবু আমের আর-রাহিব মুসলমানদের বিরুদ্ধে অংশ নেয়। সেই-ই ওহোদের যুদ্ধে গোপনে গর্ত খুঁড়ে রাখে। যাতে পড়ে গিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আহত হন এবং তিনি মারা গেছেন বলে রটিয়ে দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালানো হয়। তারই চক্রান্তে ক্বোবায় 'মসজিদে যেরার' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারই প্ররোচনায় রোম সম্রাট সরাসরি মদীনায় হামলা চালানোর পরিকল্পনা নেন। যা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষাবস্থার মধ্যেও রাসূলকে রোম সীমান্ত অভিমুখে ৯ম হিজরীতে অভিযান চালাতে হয়। যা 'তাবূক অভিযান' নামে পরিচিত। অবশেষে সে খৃষ্টানদের কেন্দ্রস্থল সিরিয়ায় আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। অথচ তার পুত্র হানযালা ছিলেন বিখ্যাত ছাহাবী এবং ওহোদ যুদ্ধের খ্যাতিমান শহীদ 'গাসীলুল মালায়েকাহ'।

ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ্র নেতৃত্বে কুরায়েশ মহিলারা বাদ্য বাজিয়ে নেচে গেয়ে নিজেদের সৈন্যদের উত্তেজিত করে তুলল। এক পর্যায়ে তারা গেয়ে উঠল,

إنْ تُقْبِلوا نُعانِقْ + ونَفْرِشُ النَّمارق
او تُدْبِروا نُفارِقْ + فِراقَ غيرَ وَامِق

'যদি তোমরা অগ্রসর হও, তবে আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করব ও তোমাদের জন্য শয্যা রচনা করব'। 'আর যদি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো, তবে আমরা পৃথক হয়ে যাব তোমাদের থেকে চিরদিনের মত।' তাতে তাদের সবাই একযোগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যুদ্ধ শুরু : ৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার সকালে যুদ্ধ শুরু হয়। সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী কুরায়েশ বাহিনীর পতাকাবাহী এবং তাদের সেরা অশ্বারোহী বীরদের অন্যতম তালহা বিন আবু তালহা আব্দুল্লাহ আল-আবদারী উটে সওয়ার হয়ে এসে প্রথমে দ্বৈরথ যুদ্ধে মুকাবিলার আহ্বান জানান। মুসলিম বাহিনীর বামবাহুর প্রধান যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে যান এবং সিংহের মত এক লাফে উটের পিঠে উঠে তাকে সেখান থেকে মাটিতে ফেলে যবেহ করে হত্যা করেন। এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ খুশীতে তাকবীর ধ্বনি দেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুবায়েরের প্রশংসায় বলেন, إنَّ لكل نبي حَوارِيًّا وحواريَّ الـــزبيرُ– 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীর একজন নিকট সহচর থাকেন। আমার সহচর হ'ল যুবায়ের'।

প্রধান পতাকাবাহীর পতনের পর তার পরিবারের আরও পাঁচ জন পরপর নিহত হয় এবং এভাবে দশ/বারো জন পতাকাবাহী মুসলিম বাহিনীর হাতে খতম হয়। যার মধ্যে একা কুযমান ৪ জনকে এবং আলী (রাঃ) ৮ জনকে হত্যা করেন। আউস গোত্রের বনু যাফর (بنو ظفر) বংশের কুযমান (قزمان) ইবনুল হারেছ ছিল একজন মুনাফিক'। সে এসেছিল নিজ বংশের গৌরব রক্ষার্থে, ইসলামের স্বার্থে নয়।

মাক্কী বাহিনীর পতাকাবাহীদের একে একে নিহত হওয়ার পর মুসলিম সেনাদল বীরদর্পে এগিয়ে যান ও মুশরিকদের

সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যায়। এই সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলকে আহ্বান করে বলেন, من يأخذ هذا السيف بحقه؟ কে আছ আমার এই তরবারি তার হক সহ গ্রহণ করবে? আলী, যুবায়ের, ওমর সহ বহু ছাহাবী একযোগে এগিয়ে এলেন তরবারি নেবার জন্য। কিন্তু এ সময় আবু দুজানাহ বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ তরবারির হক কি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أن تضربَ به وجوهَ العدو حتى يَنْحنى 'তুমি এর দ্বারা শত্রুদের মুখে মারবে, যাতে ওরা আমার থেকে সরে যায়'। তখন আবু দুজানাহ বললেন, أنا آخذ بحقه يارسول الله 'আমি এর হক আদায় করব হে আল্লাহ্র রাসূল'। তখন তিনি তাকেই তরবারি দিলেন। রাসূলের তরবারি হাতে পেয়ে আবু দুজানা খুশীতে আত্মহারা হয়ে মাথায় লাল পাগড়ী বেঁধে নিম্নের কবিতা বলতে বলতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যান।-

أنا الذي عاهدَني خليلي + ونحن بالسَّفْح لدَى النخيل

ألاَّ أقومَ الدهرَ في الكَيُّول + أضربُ بسيفِ الله والرسول

'আমরা যখন খেজুর বাগানের প্রান্তে ছিলাম, তখন আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ আমার নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, কখনোই আমি পিছনের সারিতে থাকবো না। বরং সর্বদা সম্মুখ সারিতে থেকে আল্লাহ ও রাসূলের তরবারি দ্বারা প্রতিপক্ষকে মারব'।[৪] উল্লেখ্য যে, বদরী ছাহাবী আবু দুজানাহ সিমাক বিন খারাশাহ আনছারী আল-খাযরাজী (রাঃ) সম্পর্কে লোকদের মধ্যে একথা প্রচলিত ছিল যে, তিনি যখন তার লাল পাগড়ীটি পরে যুদ্ধে নামেন, তখন আমৃত্যু লড়ে যান।

যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) বলেন, রাসূলের তরবারি চেয়েও না পাওয়াতে আমি দুঃখিত ছিলাম এবং শপথ করি যে, রাসূলের তরবারি দিয়ে আবু দুজানা কেমন যুদ্ধ করেন, আমি তা দেখব। তাই আমি সর্বদা তার পিছে পিছে থাকতাম। দেখলাম, তিনি শত্রুপক্ষের যাকেই সামনে পান, তাকেই শেষ করে ফেলেন। এভাবে তিনি মুশরিক সারিগুলি ছিন্ন ভিন্ন করে তীব্র গতিতে গিয়ে এমন একজনের মাথার উপরে তরবারি উঠান, যে মুশরিক সৈন্যদের দারুণভাবে উত্তেজিত করছিল। মাথার উপরে তরবারি দেখে সে হায় হায় করে উঠলে আবু দুজানা বুঝতে পারেন যে, ওটি একজন মহিলা। তখন তিনি অতি কষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করেন এবং বলেন, কোন মহিলাকে হত্যা করে রাসূলের তরবারিকে কলংকিত করব না'।[৫] উক্ত মহিলা ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ। বদর যুদ্ধে যার পিতা উৎবাহ, চাচা শায়বাহ, ভাই ওয়ালীদ ও পুত্র হানযালা বিন আবু সুফিয়ান নিহত হয় এবং যার প্রতিশোধ নিতেই তিনি ওহোদ যুদ্ধে এসেছিলেন ও নর্তকী দলের নেতৃত্ব দিয়ে নিজ দলের সৈন্যদের উত্তেজিত করছিলেন।

এই যুদ্ধে হযরত হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের বীরত্ব ছিল কিংবদন্তীতুল্য। প্রতিপক্ষের মধ্যভাগে প্রবেশ করে তিনি সিংহ বিক্রমে লড়াই করছিলেন। তাঁর অস্ত্রচালনার সামনে শত্রু পক্ষের কেউ টিকতে না পেরে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্র এই সিংহকে কাপুরুষের মত গোপন হত্যার মাধ্যমে শহীদ করা হয়। তাকে হত্যাকারী ওয়াহ্শী বিন হারব ছিল মক্কার নেতা জুবায়ের ইবনু মুত্ব'ইমের হাবশী গোলাম। যার চাচা তু'আইমা বিন 'আদী বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। ওয়াহ্শী ছিল বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী, যা সাধারণতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ত না। মনিব তাকে বলেছিল, তুমি আমার চাচার বিনিময়ে যদি মুহাম্মাদের চাচা হামযাকে হত্যা করতে পার, তাহ'লে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে'। ওয়াহ্শী বলেন যে, আমি কেবল আমার নিজের মুক্তির স্বার্থেই যুদ্ধে আসি এবং সর্বক্ষণ কেবল হামযার পিছনে লেগে থাকি। আমি একটি বৃক্ষ বা একটি পাথরের পিছনে ওঁৎ পেতে ছিলাম। ইতিমধ্যে যখন তিনি আমার সম্মুখে জনৈক মুশরিক সেনাকে এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন এবং তাকে আমার আওতার মধ্যে পেয়ে যাই, তখনই আমি তাঁর অগোচরে তাঁর দিকে বর্শাটি ছুঁড়ে মারি, যা তাঁর নাভীর নীচে ভেদ করে ওপারে চলে যায়। তিনি আমার দিকে তেড়ে আসেন। কিন্তু পড়ে যান ও কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আমি তার দেহ থেকে বর্শাটি বের করে নিয়ে চলে যাই'। এরপর মক্কায় ফিরে গেলে আমাকে আযাদ করে দেওয়া হয়।[৬]

উল্লেখ্য যে, মক্কা বিজয়ের পর ওয়াহশী ত্বায়েফে পালিয়ে যান। অতঃপর সেখানকার প্রতিনিধি দলের সাথে ৯ম হিজরী সনে মদীনায় এসে রাসূলের নিকট ইসলাম কবুল করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে ভবিষ্যতে পুনরায় সামনে আসতে নিষেধ করেন। ফলে তিনি রাসূলের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনো আর মদীনায় আসেননি। আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ভণ্ড নবী মুসায়লামা কাযযাবকে ইয়ামামার যুদ্ধে ঐ বর্শা দিয়েই তিনি হত্যা করেন এবং বলেন, قد قتلتُ خيرَ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتلتُ شَرَّ الناس، 'আমি রাসূলের পরে শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে হত্যা করেছিলাম। আজ আমি নিকৃষ্টতম

৪. *ইবনু হিশাম ২/৬৭-৬৮।*
৫. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ২৬০-৬১।*
৬. *ইবনু হিশাম ২/৭১-৭২।*

মানুষটিকে হত্যা করলাম'।[৭] রোমকদের বিরুদ্ধে ইয়ারমূকের যুদ্ধেও তিনি শরীক হন। তিনি ওছমান (রাঃ) অথবা আমীর মু'আবিয়ার খেলাফতকালে ইরাকের হিমছে বসবাস করেন ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

'সাইয়িদুশ শুহাদা' হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত ওহোদ যুদ্ধে তিনি একাই ৩০ জনের অধিক শত্রু সেনাকে হত্যা করেন।[৮] কেবল আবু দুজানা ও হামযা নয়, অন্যান্য বীরকেশরী ছাহাবীগণের অতুলনীয় বীরত্বের সম্মুখে কাফির বাহিনী কচুকাটা হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এমনকি তারা তাদের সেনা শিবির ছেড়ে সবকিছু ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাতে থাকে। বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, মুশরিক বাহিনীর মধ্যে পালানোর হিড়িক পড়ে গেল। তাদের নারীরা পায়ের গোছা বের করে ছুটতে লাগল। মুসলিম বাহিনী তাদের পিছনে তরবারি নিয়ে ধাওয়া করল। অতঃপর সবাই তাদের পরিত্যক্ত মালামাল জমা করতে শুরু করল।[৯]

তীরন্দাযদের ভুল ও তার খেসারত :

কাফিরদের পলায়ন ও গণীমত জমা করার হিড়িক দেখে গিরিপথ রক্ষী তীরন্দায দল ভাবল, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অতএব আর এখানে থাকার কি প্রয়োজন? গণীমতের মাল ও দুনিয়ার লোভরূপী শয়তান সাময়িকভাবে তাদের মাথায় চেপে বসল। 'গণীমত' 'গণীমত' (الغنيمة الغنيمـــة) বলতে বলতে তারা ময়দানের দিকে ছুটে চলল। অধিনায়ক আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের (রাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ১০ জন বাদে বাকী ৪০ জনের সবাই ছুটলো ময়দানের দিকে। শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীর ধুরন্ধর সেনাপতি খালেদ ইবনু ওয়ালীদ সুযোগ বুঝে নক্ষত্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ঐ ক্ষুদ্র বাহিনীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ও তাঁর সাথীগণ সকলে প্রাণপণ লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর খালেদ ও তার পশ্চাদবর্তী কুরায়েশ সেনাদল অতর্কিতে এসে অপ্রস্তুত মুসলিম সেনাদলের উপরে হামলা করল। ঐ সময় আমরাহ বিনতে আলক্বামা (عمرة بنـــت علقمـــة الحارثيـــة) নাম্মী জনৈকা কুরায়েশ মহিলা তাদের ভূলুণ্ঠিত পতাকা তুলে ধরলে চারদিক থেকে মাক্কী বাহিনী পুনরায় ময়দানে ছুটে আসে এবং অগ্র-পশ্চাৎ সবদিক থেকে মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। শুরু হ'ল মহা পরীক্ষা। মুসলিম বাহিনীর উপর নেমে আসে মহা বিপর্যয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সময় আহত হন। অতঃপর সুকৌশলে স্বীয় বাহিনীকে উচ্চভূমিতে তাঁর ঘাঁটিতে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হন। ফলে মুসলিম বাহিনী প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও সাক্ষাৎ পরাজয় থেকে বেঁচে যায়। তীরন্দাযদের ভুলের কারণে মুসলিম বাহিনীর নিশ্চিত বিজয় এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

জয়-পরাজয় পর্যালোচনা :

ওহোদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রথম দিকে বিজয়ী হয় এবং শত্রু বাহিনী ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু তীরন্দাযগণের মারাত্মক ভুলের কারণে অরক্ষিত গিরিসংকট দিয়ে শত্রুবাহিনী অতর্কিতে ময়দানে ঢুকে পড়ে। যাতে মুসলিম বাহিনী চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে আহত হন। তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়। এছাড়া মুসলিম বাহিনীর সর্বমোট ৭০ জন শাহাদাত বরণ করেন। যার মধ্যে মুহাজির ৪ জন, ইহুদী ১ জন, বাকী ৬৫ জন আনছারের মধ্যে আউস গোত্রের ২৪ জন ও খাযরাজ গোত্রের ৪১ জন ছিলেন। কুরায়েশ বাহিনীর নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন ২২ জন, কেউ বলেছেন ৩৭ জন। কিন্তু এ হিসাব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারাই বলছেন যে, একা হামযা (রাঃ) ৩০ জনের অধিক শত্রু সৈন্য খতম করেছেন। তাছাড়া আলী (রাঃ) হত্যা করেছেন ৮ জনকে, কুযমান হত্যা করেছেন ৮ জনকে। এতদ্ব্যতীত যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম, মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবু দুজানা, আবুবকর, ওমর, আছেম বিন ছাবেত, হাতেব ইবনু আবী বালতা'আহ, আবু তালহা, উম্মে 'উমারাহ, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, মুছ'আব বিন উমায়ের, উসায়েদ বিন হুযায়ের, হাব্বাব ইবনুল মুনযির, সা'দ বিন মু'আয, সা'দ বিন ওবাদাহ, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ, সা'দ ইবনু রাবী', নযর ইবনু আনাস, আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ, হানযালাহ, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ও তাঁর পিতা ইয়ামান, আবু সাঈদ খুদরীর পিতা মালিক ইবনু সিনান, জাবের-এর পিতা আব্দুল্লাহ বিন হারাম, হারিছ ইবনু ছম্মাহ, উছায়রিম, মুখাইরীক্ব, আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ, রাফে' বিন খাদীজ, সামুরাহ বিন জুনদুব, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ, ক্বাতাদাহ ইবনু নু'মান, আনাস ইবনু নাযার, ছাবিত ইবনু দাহদাহ ও তার সঙ্গীরা, আব্দুর রহমান ইবনু 'আউফ, সাহল ইবনু হুনায়েফ প্রমুখ বীর যোদ্ধাদের হাতে কত শত্রু সৈন্য খতম হয়েছে, তার হিসাব কোথায়? তিন হাযারের দুর্ধর্ষ কুরায়েশ বাহিনী কোনরূপ চরম মূল্য না দিয়েই কি ময়দান ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিল? অতএব মুসলিম বীরদের হাতে তাদের যে অগণিত সৈন্য হতাহত হয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকার কথা নয়।

দ্বিতীয়তঃ কুরায়েশ বাহিনী বিজয়ী হ'লে মুসলিম বাহিনীর ঘাঁটি দখল করল না কেন? তাদের মালামাল লুট করল না

৭. *ইবনু হিশাম ২/৭২-৭৩; বায়হাক্বী ৯/৯৭-৯৮; ফাৎহুল বারী ৭/৪২৭।*
৮. *আল-ইছাবাহ, ২/২৮৬, ক্রমিক সংখ্যা ১১০২।*
৯. *বুখারী হা/৪০৪৩, ২/৫৭৯।*

কেন? তারা মদীনার উপরে চড়াও হ'ল না কেন? সে যুগের প্রথানুযায়ী বিজয়ী দল হিসাবে তারা সেখানে ৩ দিন অবস্থান করল না কেন? কেন একজন মুসলিম সৈন্যও তাদের হাতে বন্দী হ'ল না? অথচ কাফের বাহিনীর দু'জন কবির অন্যতম আবু 'ইযযাহ মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয় এবং ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পর মুক্তিপণ হিসাবে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অতএব এটাকে 'অমীমাংসিত যুদ্ধ' বলা চলে। তবে আখেরাতের হিসাবে মুসলমানেরা সর্বদাই লাভবান এবং তারাই বিজয়ী। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا– 'শত্রুদলের পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাক, তবে তারাও আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে যেমন তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছ। (তবে পার্থক্য এই যে,) তোমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে (জান্নাত) আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১০৪)*।

যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐদিনই অর্থাৎ ৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার সন্ধ্যায় মদীনায় ফিরে আসেন। কিন্তু কুরায়েশ বাহিনী পুনরায় হামলা করতে পারে এই আশংকায় পরদিন ৮ই শাওয়াল রবিবার তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করেন কেবলমাত্র ঐসব সেনাদের নিয়ে যারা আগের দিন ওহোদ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই অনুমতি চেয়েও ব্যর্থ হয়। তবে সঙ্গত কারণে জাবের বিন আব্দুল্লাহকে অনুমতি দেন এবং ৮ মাইল দূরে গিয়ে 'হামরাউল আসাদ' (حمراء الأسد) নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন ও চারদিন পর ১২ই শাওয়াল ফিরে আসেন।

ঘটনা ছিল এই যে, এখানে পৌঁছে মা'বাদ বিন আবী মা'বাদ আল-খুযাঈ নামক জনৈক ব্যক্তি মুসলমান হন। তিনি রাসূলের হিতাকাংখী ছিলেন। তাছাড়া বনু হাশেম ও বনু খুযা'আহ্র মধ্যে পূর্ব থেকেই মৈত্রী চুক্তি ছিল। তিনি রাসূলের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আবু সুফিয়ানের নিকট গমন করেন। আবু সুফিয়ানের বাহিনী তখন মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে 'রাওহা' (الروحاء) নামক স্থানে অবতরণ করেছে। কিন্তু তখন সাথীদের চাপে আবু সুফিয়ান পুনরায় মদীনায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় মা'বাদ সেখানে পৌঁছে যান এবং আবু সুফিয়ানকে রাসূলের পশ্চাদ্ধাবন বিষয়ে অবহিত করেন ও তাকে দারুনভাবে ভীত করে ফেলেন। এমনকি বলেন যে, মুহাম্মাদের বিরাট বাহিনী টিলার পিছনে এসে গেছে। তোমরা এখুনি পালাও। আবু সুফিয়ান তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতেন না। ফলে তার কথায় বিশ্বাস করলেন ও দ্রুত মক্কায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে মা'বাদকে বলে দিলেন যে, তুমি মুহাম্মাদকে জানিয়ে দিয়ো যে, আমরা অতি সত্বর পুনরায় তাদের উপর হামলা করব এবং তাকে ও তার সাথীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলব'। মা'বাদ রাযী হলেন। অতঃপর তিনি রাসূলের নিকট এসে উক্ত খবর জানালে মুসলিম বাহিনীর ঈমানী তেজ আরো বেড়ে যায় এবং তারা বলে ওঠেন, حسبنا الله ونعم الوكيل 'আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। আর তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'।

অন্য দিকে আবু সুফিয়ানের গুপ্তচর মু'আবিয়া বিন মুগীরাহ বিন আবুল 'আছ যে ব্যক্তি উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নানা ছিল, মদীনায় পৌঁছে তার চাচাতো ভাই ওছমান (রাঃ)-এর নিকটে আশ্রয় নেয়। ওছমানের আবেদনক্রমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তিন দিনের জন্য অনুমতি দেন এবং বলেন, এর পরে পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মদীনা ছেড়ে গেলে সে গোপন সংবাদ সংগ্রহে লিপ্ত হয় এবং ৪দিন পর রাসূল (ছাঃ) ফিরে আসার সাথে সাথে পালিয়ে যায়। তখন তিনি যায়েদ বিন হারেছাহ ও আম্মার বিন ইয়াসিরকে পাঠান এবং তার পিছু ধাওয়া করে তাকে পাকড়াও করে হত্যা করেন। এভাবে ওহোদ যুদ্ধের পরবর্তী চক্রান্ত সমূহ শেষ করে দিয়ে রাসূল (ছাঃ) নিশ্চিন্ত হন।

ওহোদ যুদ্ধের বিষয়ে কুরআন :

ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ১২১ হ'তে ১৭৯ পর্যন্ত পরপর ৬০টি আয়াত নাযিল হয়। যার মধ্যে যুদ্ধের এক একটি পর্বের আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর ঐসব কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলির ফলে মুসলিম বাহিনী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সেখানে মুনাফিকদের অপতৎপরতার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর যুদ্ধের ফলাফল ও এর অন্তর্নিহিত গুঢ় রহস্যের উপরে আলোকপাত করে বলা হয়েছে, مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ– 'নাপাককে পাক হ'তে পৃথক করে না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই ছেড়ে দিবেন, যে অবস্থায় তোমরা আছ। আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদেরকে গায়েবের খবর জানাবেন...' *(আলে ইমরান ৩/১৭৯)*।

অর্থাৎ মুনাফিকদের পৃথক করা ও মুমিনদের ঈমানের দৃঢ়তা পরখ করা ছিল এ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আর

একথাগুলি অহীর মাধ্যমে না জানিয়ে বাস্তব প্রমাণের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়াই ছিল ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের অন্যতম তাৎপর্য।

ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের রহস্য :

ইবনু হাজার বলেন, বিদ্বানগণ বলেন যে, ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের মধ্যে আল্লাহ্র বিশেষ রহস্য ও তাৎপর্য সমূহ নিহিত ছিল। যেমন- (১) রাসূলের অবাধ্যতার পরিণাম সম্পর্কে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা। কেননা তীরন্দাযগণের অবাধ্যতার ফলে আকস্মিক এই বিপর্যয় নেমে আসে (২) রাসূলগণের জন্য সাধারণ নিয়ম এই যে, তারা প্রথমে বিপদগ্রস্থ হন এবং শেষে বিজয়ী হন। কেননা যদি তাঁরা সর্বদা কেবল বিজয়ী হ'তে থাকেন, তাহ'লে মুমিনদের মধ্যে এমন লোকও ঢুকে পড়বে, যারা তাদের নয়। আবার যদি তারা কেবল পরাজিত হ'তেই থাকেন, তাহ'লে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হাছিল হবে না। সেকারণ জয় ও পরাজয় দু'টিই একত্রে রাখা হয়, যাতে প্রকৃত ঈমানদার ও কপট বিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। (৩) কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাহায্য দেরীতে আসলে মুমিনদের হৃদয়ে অধিক নম্রতার সৃষ্টি হয় এবং অহংকার চূর্ণ হয়। তারা অধিক ধৈর্যশীল হয়। পক্ষান্তরে মুনাফিকগণ দিশেহারা হয়। (৪) আল্লাহ মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার এমন স্তর সমূহ নির্ধারণ করেছেন, যেখানে পৌঁছানোর জন্য তাদের আমল সমূহ যথেষ্ট হয় না। তখন আল্লাহ তাদের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা ও বিপদাপদ সমূহ নির্ধারণ করেন। যাতে তারা সেখানে পৌঁছতে পারেন। (৫) আউলিয়াগণ অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণের জন্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা হ'ল শাহাদাত লাভ করা। সেকারণ আল্লাহ তাদের নিকটে সে সুযোগ পৌঁছে দেন। (৬) আল্লাহ তার শত্রুদের ধ্বংস করতে চান। সেকারণ তিনি এমন কার্যকারণ সমূহ নির্ধারণ করে থাকেন, যা তাদের কুফরী, সীমালংঘন ও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে রূপ লাভ করে। এর দ্বারা তিনি মুমিনদের গোনাহ সমূহ দূর করে দেন ও কাফির-মুনাফিকদের সংকুচিত ও ধ্বংস করেন।[১০]

বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত রহস্য ও তাৎপর্য সমূহ কেবল ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুমিনগণের জন্যই নয়, বরং যুগে যুগে আল্লাহ্র পথে জীবন উৎসর্গকারী সকল মুমিনের জন্য প্রযোজ্য।

ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আক্বীদা :

ছাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ মা'ছূম ছিলেন না। শয়তান সাময়িকভাবে হ'লেও তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে *(আলে ইমরান ৩/১৫৫)*। সেজন্য আল্লাহ পাক মাঝে-মধ্যে পরীক্ষায় ফেলে তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দেন, যেমন ওহোদের যুদ্ধে করেছেন। তবে আল্লাহ তাদের মাফ করে দিয়েছেন *(আলে ইমরান ৩/১৫২)* এবং তাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন *(তওবা ৯/১০০)*। তাদের বিশাল সৎকর্ম সমূহ ছোট খাট গোনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে নিয়ে গেছে *(হূদ ১১/১১৪)*। রাসূলের ভাষায় 'ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও ছাহাবায়ে কেরামের কোন একজনের (সৎকর্মের) সমপরিমাণ বা তার অর্ধেকও হবে না।[১১] ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, শাম বিজয় কালে সেখানকার নাছারাগণ ছাহাবীগণকে দেখে বলেছিল, 'আল্লাহর কসম! এঁরা আমাদের হাওয়ারীদের চাইতে উত্তম' (هؤلاء خير من الحواريين) ইবনু কাছীর বলেন, তারা সত্য কথাই বলেছিল। কেননা ছাহাবীগণ সম্পর্কে বিগত এলাহী কিতাব সমূহেও বর্ণনা রয়েছে।[১২]

ওহোদ যুদ্ধের কতগুলি উল্লেখযোগ্য দিক ও শিক্ষণীয় ঘটনা

(১) 'আব্দুল্লাহ' নামের কাফেরগণ-

(ক) কুরায়েশ বাহিনীর পতাকাবাহী বনু আব্দুদ্দার-এর নিহত ১০ জন পতাকাবাহীর প্রথম ৬ জনের সকলেই ছিল আবু তালহা আব্দুল্লাহ বিন ওছমান ইবনু আব্দিদ্দারের পুত্র অথবা পৌত্র।

(খ) কুরায়েশ তীরন্দায বাহিনীর অধিনায়ক ছিল বদর যুদ্ধে নিহত উৎবাহ্র ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু রাবী'আহ।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে সরাসরি আঘাতকারী তিনজন কাফের সৈন্যের দ্বিতীয় জন ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী, যার আঘাতে রাসূলের ললাট রক্তাক্ত হয়। ইনি ছিলেন পরবর্তীকালে বিখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব যুহরী (৫৮-১২৪ হিঃ)-এর দাদা। তৃতীয় জন ছিল আব্দুল্লাহ বিন ক্বামআহ লায়ছী, যার আঘাতে শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া রাসূলের চোখের নীচে চেহারার মধ্যে ঢুকে যায়। শেষোক্ত ব্যক্তি একই সময়ে মুহাজিরগণের পতাকাবাহী মুছ'আব বিন ওমায়েরকে হত্যা করে এবং চেহারায় মিল থাকার কারণে তাকেই রাসূল ভেবে রাসূল নিহত হয়েছেন বলে সে সর্বত্র রটিয়ে দেয়।

১০. *যাদুল মা'আদ ২/৯৯-১০৮; ফাৎহুল বারী ৭/৩৪৭ পৃঃ।*

১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮।*
১২. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ফাৎহ ২৯ আয়াত।*

(ঘ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাঁর সৈন্যদের শিবিরে ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন তাঁর উপরে হামলাকারী প্রথম কাফের সৈন্যটির নাম ছিল উছমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুগীরাহ। দ্বিতীয় কাফির সৈন্যটির নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন জাবের। প্রথমজন হারেছ ইবনু ছাম্মাহ্র আঘাতে এবং দ্বিতীয় জন আবু দুজানার হাতে নিহত হয়। এইসব আব্দুল্লাহগণ আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও এরা আল্লাহ্র বিধান মানতে ও রিসালাত-এর উপরে ঈমান আনতে রাযী ছিল না। এক কথায় তারা তাওহীদে ববূরিয়াতে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তওহীদে ইবাদতে বিশ্বাসী ছিল না। মুমিন হওয়ার জন্য যা অপরিহার্য শর্ত।

(২) পিতা ও পুত্র পরস্পরের বিপক্ষে :

হিজরতের পূর্বে মদীনার আউস গোত্রের সর্দার ও ধর্ম যাজক ছিল আবু আমের 'আর-রাহেব'। হিজরতের পরে সে মক্কায় চলে যায় এবং কুরায়েশদের পক্ষে ওহোদ যুদ্ধে যোগদান করে। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) তার লকব দেন আবু আমের 'আল-ফাসেক্ব'। পক্ষান্তরে তার পুত্র 'হানযালা' ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সেই তরুণ সৈন্য যিনি সবেমাত্র বিয়ে করে বাসর যাপন করছিলেন। অতঃপর যুদ্ধের ঘোষণা শুনেই নাপাক অবস্থায় ময়দানে চলে আসেন এবং ভীষণ তেজে যুদ্ধ করে শহীদ হন। ফেরেশতাগণ তাকে গোসল দেন। এজন্য তাঁকে 'গাসীলুল মালায়েকাহ' বলা হয়।

(৩) দুই ভাই পরস্পরের বিপক্ষে :

ওহোদ যুদ্ধে রাসূলের উপরে হামলাকারী তিন জনের প্রথম জন ছিল উৎবাহ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ। তার নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতেই রাসূলের ডান দিকের নীচের রুবাঈ দাঁত ভেঙ্গে যায়। পরে হাতেব বিন আবী বালতা'আহ (রাঃ) তার পিছনে ধাওয়া করেন এবং এক আঘাতেই তার মস্তক দেহচ্যুত করে ফেলেন ও তার ঘোড়া ও তরবারি দখল করে নেন। এই উৎবাহর ভাই ছিলেন 'ইসলামে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী' এবং মুসলিম বাহিনীর খ্যাতনামা বীর ও পরবর্তীকালে ইরাক বিজেতা সেনাপতি হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)।

(৪) ওহোদ যুদ্ধে কুরায়েশ মহিলাদের তৎপরতা :

(ক) কুরায়েশ পক্ষে প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ ১৫ জনের মহিলা দলের নেতৃত্ব দেন। তারা নেচে গেয়ে তাদের সৈন্যদের উত্তেজিত করেন। যুদ্ধে আবু দুজানার তরবারির হাত থেকে হিন্দা বেঁচে যান তার হায় হায় শব্দে তাকে নারী হিসাবে চিনতে পারার কারণে। (খ) পলায়ণপর কুরায়েশ বাহিনী যখন পুনরায় অরক্ষিত গিরিপথ দিয়ে ময়দানে আবির্ভূত হয়, তখন কুরায়েশ বাহিনীর ভূলুণ্ঠিত যুদ্ধ পতাকা আমরাহ বিনতে আলক্বামাহ নাম্মী এক কুরায়েশ মহিলা অসীম বীরত্বের সাথে দ্রুত উঁচু করে তুলে ধরেন। যা দেখে বিক্ষিপ্ত ও পলায়ণরত কুরায়েশ বাহিনী পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসে ও গণীমত কুড়ানোয় ব্যস্ত মুসলিম বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে।

(৫) ওহোদ যুদ্ধে মুসলিম মহিলাদের ভূমিকা :

(ক) উম্মে আয়মন : যখন তিনি দেখলেন যে, কুরায়েশ বাহিনীর শেষোক্ত হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে মুসলিম বাহিনীর কেউ কেউ মদীনায় ঢুকে পড়ছে। তখন তিনি তাদের চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলেন ও বলতে লাগলেন هاكَ المغزل وهلم سيفك 'তোমরা এই সূতা কাটার চরকা নাও এবং আমাদেরকে তরবারি দাও'। এই বলে তিনি দ্রুতগতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছেন এবং আহতদের পানি পান করাতে শুরু করেন। তার উপরে জনৈক শত্রুসৈন্য তীর চালিয়ে দিলে তিনি পড়ে যান ও বিবস্ত্র হয়ে যান'। এ দেখে আল্লাহ্র শত্রু হো হো করে হেসে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছকে একটি পালকবিহীন তীর দিয়ে বলেন, এটা ওর উপরে চালাও'। সা'দ ওটা চালিয়ে দিলে ঐ শত্রুটির গলায় বিদ্ধ হয় ও চিৎ হয়ে পড়ে বিবস্ত্র হয়ে যায় এবং রাসূল (ছাঃ) হেসে ওঠেন।

(খ) যুদ্ধ শেষে কিছু মুসলিম মহিলা ময়দানে আগমন করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা বিনতে আবুবকর, উম্মে সুলায়েম (أم سُلَيم), উম্মে সুলাইত্ব (أم سُلَيط) প্রমুখ ছিলেন। যারা পিঠের উপরে মশক বহন করে এনে আহত সৈনিকদের পানি পান করান।[১৩]

(গ) যুদ্ধ শেষে ঘাঁটিতে স্থিতিশীল হওয়ার পর কন্যা ফাতিমা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যখম ধুয়ে ছাফ করেন এবং জামাতা আলী তার ঢালে করে পানি এনে তাতে ঢেলে দেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, তাতে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। তখন ফাতিমা (রাঃ) চাটাইয়ের একটা অংশ জ্বালিয়ে তার ভস্ম ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন। তাতে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।[১৪] এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মানুষ নবী ছিলেন, নূরের নবী নন। তাছাড়া এটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, চিকিৎসা গ্রহণ করা নবীগণের মর্যাদার বিরোধী নয়।

(ঘ) উম্মে উমারাহ নুসাইবাহ বিনতে কা'ব যিনি ১৩ নববী বর্ষে মক্কায় অনুষ্ঠিত আক্বাবায়ে কুবরায় শরীক ছিলেন, তিনি অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে আহতদের সেবা-শুশ্রূষায় রত ছিলেন। যখন শুনলেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)

১৩. *বুখারী হা/৪০৬৪, ২/৫৮১।*
১৪. *বুখারী হা/৪০৭৫, ২/৫৮৪।*

কাফেরদের মধ্যে ঘেরাও হয়েছেন তখন ছুটে এসে বীর বিক্রমে কাফেরদের প্রতি তীর বর্ষণ শুরু করেন। রাসূলকে আঘাতকারী ইবনু ক্বামআহকে তিনি তরবারি দ্বারা কয়েকবার আঘাত করেন। কিন্তু লৌহ বর্মধারী হওয়ায় সে বেঁচে যায়। পাল্টা তার আঘাতে উম্মে উমারাহ দারুণভাবে আহত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঐ বিপদের সময়ে আমি ডাইনে-বামে যেদিকে তাকাই সেদিকেই উম্মে উমারাহকে দেখি, আমাকে রক্ষা করার জন্য তিনি অবিরাম গতিতে যুদ্ধ করে চলেছেন'। ঐ দিন উম্মে উমারাহ্র দেহে ১২টি যখম লেগেছিল।

৬। ফেরেশতারা যাঁকে গোসল দিলেন :

যুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা শুনেই বাসর ঘর ছেড়ে ত্বরিৎ গতিতে যুদ্ধের ময়দানে এসে শত্রুদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন সদ্য বিবাহিত যুবক হানযালা বিন আবু আমের আর-রাহিব। অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তিনি শত্রু বাহিনীর সারিগুলি তছনছ করে মধ্যভাগে পৌঁছে যান। অতঃপর কুরায়েশ সেনাপতি আবু সুফিয়ানের মাথার উপরে তরবারি উত্তোলন করেন তাকে খতম করে দেবার জন্য। কিন্তু সেই মুহূর্তে শত্রুসৈন্য শাদ্দাদ বিন আউসের আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হন ও শাহাদাত বরণ করেন।

যুদ্ধশেষে হানযালার মৃত দেহ অদৃশ্য ছিল। অনেক সন্ধানের পর এক স্থানে এমন অবস্থায় পাওয়া গেল যে, যমীন হ'তে উপরে রয়েছে এবং ওটা হ'তে টপটপ করে পানি পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'ফেরেশতারা তাকে গোসল দিচ্ছেন'। পরে তার স্ত্রীর কাছে প্রকৃত ব্যাপারটি জানা যায় যে, তিনি নাপাকীর গোসল ছাড়াই যুদ্ধের ময়াদনে ছুটে এসেছিলেন। ফলে তখন থেকে হযরত হানযালা 'গাসীলুল মালায়েকাহ' (غسيل الملائكة) বা 'ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসলকৃত' বলে অভিহিত হন।

৭। নিজেদের হাতে নিজেদের মৃত্যু :

খালেদ বিন ওয়ালীদের অতর্কিত হামলায় দিশেহারা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দু'ধরনের লোকের সৃষ্টি হয়। একদল কাফিরদের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে জান বাঁচানোর জন্য কেউ পালিয়ে গিয়ে মদীনায় ঢুকে পড়ে। কেউ পাহাড়ের মাথায় উঠে পড়ে এবং অন্যদল শত্রু সেনাদের মধ্যে মিশে যায়। ফলে পরস্পরকে চিনতে ব্যর্থ হয়ে মুসলমানের হাতেই কোন কোন মুসলমান শহীদ হয়ে যান। এমনই অবস্থার শিকার হন খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর বৃদ্ধ পিতা হযরত ইয়ামান (রাঃ)। এ সময় হুযায়ফা চীৎকার দিয়ে বলেন, أي عبـــاد الله أبي أبي 'হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আমার পিতা, আমার পিতা! কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।[১৫] তখন হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 'আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন! তিনি শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী'।[১৬] আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে তার পিতার রক্তমূল্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা না নিয়ে মাফ করে দেন।

৮। মুশরিকদের বেষ্টনীতে রাসূল (ছাঃ); সাথী মাত্র নয়জন জান কোরবান ছাহাবী :

যুদ্ধ চলা অবস্থায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নয় জন সাথী সহ সেনাবাহিনীর পিছনে থেকে সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পান যে, সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে খালেদ বিন ওয়ালীদ সসৈন্যে ঢুকে পড়ছে। তখন তিনি সাক্ষাত বিপদ বুঝতে পেরে নিজে আত্মরক্ষা করে শিবিরের দিকে না গিয়ে চীৎকার দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে ডাক দিলেন 'হে আল্লাহ্র বান্দারা এদিকে' (إلىّ عبـــاد الله، إلىّ عبـــاد الله) বলে। এতে মুশরিক বাহিনী তাঁর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে চারদিক থেকে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من يردهم عنا وهو رفيقـــي في الجنـــة 'যে ব্যক্তি আমাদের থেকে ওদের হটিয়ে দেবে সে ব্যক্তি আমার সাথে জান্নাতে থাকবে' *(মুসলিম)*। তখন তাঁকে বাঁচানোর জন্য সাথী একে একে সাত জন আনছার ছাহাবীর সকলে জীবন দিলেন। এদের মধ্যে সর্বশেষ আনছার ছাহাবী ছিলেন উমারাহ ইবনু ইয়াযীদ ইবনুস সাকান (রাঃ)। বাকী রইলেন মাত্র দু'জন মুহাজির ছাহাবী হযরত ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ এবং সা'দ বিন আবী ওয়াক্ক্বাছ (রাঃ)।[১৭] তাদের অতুলনীয় বীরত্বের মুখে কাফের বাহিনী এগিয়ে আসতে বাধাগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে কুরআন বলেছে, إِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلاَ تَلْوُوْنَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِـــيْ أُخْـــرَاكُمْ– 'যখন তোমরা (ভয়ে পাহাড়ের) উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পিছন দিকে কারু প্রতি ফিরে তাকাচ্ছিলে না, অথচ রাসূল তোমাদের ডাকছিলেন তোমাদের পিছন দিক থেকে ... *(আলে ইমরান ৩/১৫৩)*।

৯। রাসূলের দান্দান মুবারক শহীদ হ'ল :

১৫. *বুখারী হা/৪০৬৫, ১/৫৩৯, ২/৫৮১।*
১৬. *ইবনে হিশাম ২/৮৭-৮৮; হাকেম ৩/২০২, সনদ ছহীহ।*
১৭. *মুসলিম হা/৪৬৪১, ২/১০৭।*

ত্বালহা ও সা'দ ব্যতীত যখন রাসূলের পাশে আর কেউ নেই।[১৮] তখন এই সুযোগে তাঁকে হত্যা করার জন্য কাফেররা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। প্রথমে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছের ভাই উৎবাহ বিন আবী ওয়াক্কাছ রাসূলের চেহারা লক্ষ্য করে সজোরে পাথর নিক্ষেপ করে। তাতে রাসূলের ডান দিকের নীচের রুবাঈ দাঁতটি ভেঙ্গে যায় ও নীচের ঠোঁটটি আহত হয়। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী এগিয়ে এসে তাঁর ললাটে তরবারির আঘাত করে যখম করে দেয়। এরপর আব্দুল্লাহ বিন ক্বামআহ নামক এক দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী এসে তার কাঁধের উপরে ভীষণ জোরে তরবারির আঘাত করে। যা তাঁর লৌহবর্ম ভেদ করতে না পারলেও তার ব্যথা ও কষ্ট তিনি এক মাসের অধিক সময় অনুভব করেন। তারপর সে দ্বিতীয় বার আঘাত করে। যাতে তাঁর শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া তাঁর চোখের নীচের হাড়ের মধ্যে ঢুকে থেকে যায়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাচ্ছিল্য করে আব্দুল্লাহ বলে خذ هذا وأنا ابن قمئة 'এটা লও। আমি ক্বামআহ্র (টুকরাকারিণীর) বেটা'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) তাকে বদ দো'আ করে বলেন, أقمأك الله 'আল্লাহ তোকে টুকরা টুকরা করুন'।[১৯]

১০। রাসূলের উপরে হামলাকারীদের পরিণতি :

প্রথম হামলাকারী উৎবাহ বিন আবী ওয়াক্কাছ যার নিক্ষিপ্ত পাথরে রাসূলের দান্দান মুবারক শহীদ হয়, তার ভাই সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) এর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই হাতেব বিন আবী বালতা'আহ তার পিছে ধাওয়া করে এক আঘাতেই তার মস্তক দেহচ্যুত করে ফেলেন এবং তার ঘোড়া ও তরবারি দখল করে নেন।

দ্বিতীয় হামলাকারী আব্দুল্লাহ বিন শিহাব যুহরী, যার আঘাতে রাসূলের ললাট দেশ যখম হয়, তার পরিণতি জানা যায়নি।

তৃতীয় আঘাতকারী আব্দুল্লাহ বিন ক্বামআহ, যার তরবারির আঘাতে রাসূলের শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া তাঁর চক্ষুর নীচের হাড়ের মধ্যে ঢুকে যায় এবং যাকে রাসূল (ছাঃ) 'আল্লাহ তোকে টুকরা টুকরা করুন' বলে বদদো'আ করেছিলেন, তার পরিণতি হয়েছিল এই যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের দো'আ কবুল করেন এবং তার উপরে তার বকরীদের বিজয়ী করে দেন। ঘটনা ছিল এই যে, যুদ্ধ হ'তে মক্কায় ফিরে সে তার বকরী পালের খোঁজে পাহাড়ের দিকে যায় এবং তার বকরীগুলিকে পাহাড়ের চূড়ায় দেখতে পায়। অতঃপর সে সেখানে উঠে বকরী খেদিয়ে আনতে গেলে হঠাৎ শক্তিশালী পাঁঠা ছাগলটি তাকে শিংয়ের প্রচণ্ড গুঁতা মেরে ফেলে দেয়। অতঃপর তাকে পাহাড় থেকে নীচে ফেলতে ফেলতে এবং শিংয়ের গুঁতা মারতে মারতে টুকরা টুকরা করে ফেলে।[২০]

১১। রাসূলের পায়ের উপরে মাথা রেখে শহীদ হ'লেন যিনি :

কাফেরদের বেষ্টনীতে পড়ে গেলে সেই সংকট মুহূর্তে সপ্তম আনছার ছাহাবী উমারাহ ইবনু ইয়াযীদ ইবনুস সাকান যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে লুটিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ছাহাবায়ে কেরাম এসে পড়েন ও কাফেরদের হটিয়ে দিয়ে তাকে উঠিয়ে রাসূলের কাছে নিয়ে যান। রাসূল (ছাঃ) তার মুখমণ্ডল নিজের পায়ের উপরে রাখেন। অতঃপর তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। এটাই যেন ছিল তার মনের বাসনা যে, 'প্রাণ যেন নির্গত হয় আপনার পদচুম্বনে'। এই ঘটনায় উর্দু কবি গেয়েছেন,

سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے
یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کي جائے ہے

'যবহের সময় নিজের মাথা
রাসূলের পায়ের উপর
দুনিয়া হ'তে প্রস্থানকালে 'আল্লাহু আকবর'
কতই না বড় সৌভাগ্য তার!'

[ক্রমশঃ]

১৮. *বুখারী হা/৪০৬০, ২/৫৮১, ১/৫১৭।*
১৯. *ফাৎহুল বারী ৭/৪৩২, 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায়, ২৪ অনুচ্ছেদ।*
২০. *ফাৎহুলবারী ৭/৪৩২।*

জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

মুযাফফর বিন মুহসিন

(৫ম কিস্তি ফেব্রুয়ারী সংখ্যার পর)

ছালাতের ফযীলত

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে ছালাতের ফযীলত সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা রয়েছে। যার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দা ছালাতের প্রতি মনোযোগী হ'তে পারে এবং বিশুদ্ধতা ও একাগ্রতার সাথে একনিষ্ঠচিত্তে ছালাত সম্পাদন করতে পারে। এক কথায় ছালাতের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অমীয় বাণীই যথেষ্ট। কিন্তু বর্তমানে সেই অভ্রান্ত বাণী ছেড়ে যঈফ ও জাল হাদীছ এবং মিথ্যা, উদ্ভট, কাল্পনিক কাহিনীই শুনানো হচ্ছে। বই-পুস্তক লিখে ও বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এগুলো মানুষের হৃদয়ে কোন প্রভাব ফেলে না। আমরা এই অধ্যায়ে সেগুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি ছহীহ দলীলগুলোও উল্লেখ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

(১) ছালাত জান্নাতের চাবি :

উক্ত মর্মে যে হাদীছ সমাজে চালু আছে তা যঈফ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاَةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ-

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের চাবি হ'ল ছালাত। আর ছালাতের চাবি হ'ল পবিত্রতা।[২১]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটির প্রথম অংশ যঈফ।[২২] আর দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে পৃথক সনদে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২৩]

প্রথম অংশ যঈফ হওয়ার কারণ হ'ল- উক্ত সনদে দু'জন দুর্বল রাবী আছে। (ক) সুলায়মান বিন করম ও (খ) আবূ ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তাত।[২৪]

জ্ঞাতব্য : জান্নাতের চাবি সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু আলোচনা করতে গিয়ে ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) থেকে যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা হ'ল- তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করা হ'ল-

أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلاَّ لَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلاَّ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ-

'লা ইলা-হা ইল্লাহ' কি জান্নাতের চাবি নয়? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে প্রত্যেক চাবির দাঁত রয়েছে। তুমি যদি এমন চাবি নিয়ে আস যার দাঁত রয়েছে তাহ'লে তোমার জন্য জান্নাত খোলা হবে। অন্যথা খোলা হবে না'।[২৫] এছাড়াও আরো অন্যান্য হাদীছ দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়।[২৬] বুঝা যাচ্ছে যে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' জান্নাতের চাবি আর শরী'আতের অন্যান্য আমল-আহকাম অর্থাৎ ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ঐ চাবির দাঁত।

(২) এক ওয়াক্ত ছালাত ছুটে গেলে এক হুকবা বা দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً حَتَّى مَضَى وَقْتُهَا ثُمَّ قَضَى عُذِّبَ فِى النَّارِ حُقْبًا وَالْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً كُلُّ سَنَةٍ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ أَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ-

নবী (ছাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত ছেড়ে দেয় আর ইতিমধ্যে ঐ ছালাতের ওয়াক্ত পার হয়ে যায় এবং ছালাত আদায় করে নেয় তবুও তাকে এক হুকবা জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। এক হুকবা হ'ল ৮০ বছর। আর প্রত্যেক বছর ৩৬০ তিন। আর প্রত্যেক দিন এক হাযার বছর, যেভাবে গণনা করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত হিসাব অনুযায়ী সর্বমোট দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর হয়।[২৭]

তাহক্বীক্ব : উক্ত বক্তব্যটি তাবলীগ জামা'আতের অনুসরণীয় গ্রন্থ ফাযায়েলে আমল-এর ফাযায়েলে নামায অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোন প্রমাণ পেশ করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে,

كَذَا فِىْ مَجَالِسِ الْأَبْرَارِ قُلْتُ لَمْ أَجِدْهُ فِيْمَا عِنْدِىْ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ-

'এভাবেই মাজালিসুল আবরারে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আমার নিকটে হাদীছের যে সমস্ত গ্রন্থ রয়েছে তার মধ্যে

---

২১. মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৭০৩; তিরমিযী হা/৪; মিশকাত হা/২৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৪, ২/৪৩; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৮৮।

২২. যঈফুল জামে' হা/৫২৬৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬০৯; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২১২।

২৩. আবূদাউদ হা/৬১; তিরমিযী হা/৩; মিশকাত হা/৩১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯১, ১/৫১।

২৪. سنده ضعيف فيه سليمن بن قرم عن أبى يحيى القتات وهما ضعيفان لسوء حفظهما -আলবানী, মিশকাত হা/২৯৪-এর টীকা দ্রঃ ১/৯৭ পৃঃ; শু'আইব আরনাঊত্ব, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৭০৩-এর আলোচনা দ্রঃ।

২৫. ছহীহ বুখারী ১/১৬৫ পৃঃ; হা/১২৩৭-এর পূর্বের আলোচনা দ্রঃ।

২৬. ছহীহ বুখারী হা/৫৮২৭, ২/৮৬৭ পৃঃ, 'পোষাক' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৩; ছহীহ মুসলিম হা/২৮৩, ১/৬৬ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪২; মিশকাত হা/২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯; ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬, ১/৪৫ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২; মিশকাত হা/৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫।

২৭. ফাযায়েলে আমল (উর্দূ), পৃঃ ৩৯; বাংলা, পৃঃ ১১৬।

আমি উহা পাইনি'।[২৮] লেখক নিজেই যেহেতু স্বীকার করেছেন, সেহেতু আর মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। দুঃখজনক হ'ল এরপরও তা রাসূল (ছাঃ) নামে বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদের শামিল।

জ্ঞাতব্য : ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিকোণ থেকেও কথাটি সঠিক নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঘুম বা ভুলের কারণে যে ব্যক্তির ছালাত ছুটে যাবে তার কাফফারা হ'ল যখন স্মরণ হবে তখন তা পড়ে নিবে'।[২৯] এছাড়া রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্য ডুবার পর আছরের ছালাত আদায় করেন অতঃপর মাগরিবের ছালাত আদায় করেন।[৩০] তাছাড়া ফজর ছালাতও একদিন তাঁরা সূর্য্যের তাপ বাড়ার পরে পড়েছেন।[৩১] তাহলে তাঁদের শাস্তি কত বছর হবে? (নাঊযুবিল্লাহ)।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن العاص عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ-

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদিন ছালাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতের সংরক্ষণ করবে ক্বিয়ামতের দিন তা তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে তার হেফাযত করবে না তার জন্য তা জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে না। ক্বিয়ামতের দিন সে কারূন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনু খালাফের সাথী হবে।[৩২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[৩৩] উক্ত হাদীছের সনদে ঈসা ইবনু হে'লাল ছাদাফী নামক একজন দুর্বল রাবী আছে।[৩৪] উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছকে মিশকাতে ছহীহ বলা হ'লেও চূড়ান্ত তাহক্বীক্বে যঈফ প্রমাণিত হয়েছে।[৩৫]

২৮. ফাযায়েলে আমল (উর্দূ), পৃঃ ৩৯; বাংলা, পৃঃ ১১৬।
২৯. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৭, 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়, 'যে ব্যক্তি ছালাত ভুল করে' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম হা/১৫৯২, ১৫৯৮, ১৬০০, 'সমজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/৬০৩, ৬৮৪।
৩০. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৬ ও ৫৯৮, 'ছালাতের সময়' অধ্যায়, 'ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করেছেন' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৬২, 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭।
৩১. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৯২, ১/২৩৮ পৃঃ, 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/৬৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩৩, ২/২০৮ পৃঃ।
৩২. আহমাদ হা/৬৫৭৬; মিশকাত হা/৫৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩১, ২/১৬৪ পৃঃ।
৩৩. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩১২; তারাজুউল আলবানী হা/২৯।
৩৪. মিশকাত হা/৫৭৮, ১/১৮৩ পৃঃ।
৩৫. তারাজুউল আলবানী হা/২৯।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দিল সে যেন প্রকাশ্য কুফুরী করল।[৩৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[৩৭] ইমাম তাবারাণী হাদীছটি যঈফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, আবূ জাফর রাযী থেকে হাশেম বিন কাসেম ছাড়া কেউ হাদীছটি বর্ণনা করেননি। মুহাম্মাদ ইবনু আবূদাঊদ তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছে।[৩৮]

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ-

'ছালাত হ'ল দ্বীনের খুঁটি। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত কায়েম করল সে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করল। আর যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিল দ্বীনকে ধ্বংস করল'।[৩৯]

তাহক্বীক্ব : সমাজে হাদীছটির সমধিক প্রচার থাকলেও হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটি বাতিল ও মুনকার।[৪০]

ছালাত পরিত্যাগকারীর হুকুম :

ছালাত পরিত্যাগকারীর জন্য ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে। কারণ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। আর শ্রেষ্ঠ ও প্রধান ইবাদত হ'ল ছালাত। ছালাত পরিত্যাগকারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ-

'সুতরাং তারা যদি তওবা করে, ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবেই তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই *(তওবা ১১)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

৩৬. তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত হা/৩৩৪৮।
৩৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫০৮ ও ৫১৮০; যঈফুল জামে' হা/৫৫২১; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০৪।
৩৮. لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم تفرد به محمد بن أبي داود-আল-মু'জামুল আওসাত হা/৩৩৪৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫০৮।
৩৯. কাশফুল খাফা ২/৩২ পৃঃ; তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩৮; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ২৯।
৪০. কাশফুল খাফা ২/৩১ পৃঃ।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا–

'তাদের পর আসল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা ছালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই ধ্বংসে (জাহান্নামের গভীরে) পতিত হবে *(মারইয়াম ৫৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কিসে সাক্বার জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা ছালাত আদায়কারী ছিলাম না' *(মুদ্দাছ্ছির ৪১-৪৩)*।

উক্ত আলোচনা প্রমাণ করে ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি মুসলিম ভাই হ'তে পারে না; বরং ছালাত ত্যাগ করার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। রাসূল (ছাঃ) আরো স্পষ্ট করে বলেন,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ–

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছা)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি আর মুশরিক ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য হ'ল ছালাত পরিত্যাগ করা'।[৪১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ–

আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের ও তাদের (কাফের, মুশরিক ও মুনাফিক) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হ'ল ছালাত। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিবে সে কুফুরী করবে'।[৪২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব উকায়লী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ আমল সমূহের মধ্যে কোন আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী বলতেন না, ছালাত ব্যতীত।[৪৩]

৪১. ছহীহ মুসলিম হা/২৫৬ ও ২৫৭, ১/৬১ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭; মিশকাত হা/৫৬৯।
৪২. তিরমিযী হা/২৬২১, ২/৯০ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, 'ছালাত ত্যাগ করা' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ হা/৪৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৫৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৭, ২/১৬২ পৃঃ, সনদ ছহীহ।
৪৩. তিরমিযী হা/২৬২২, ২/৯০ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, 'ছালাত' পরিত্যাগ করা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩২, ২/১৬৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

অতএব যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করবে না সে নিঃসন্দেহে কুফুরী করবে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ ছালাত ছেড়ে দিলে বা অস্বীকার করলে সে ইসলাম থেকে যে বের হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৪৪]

(৩) ছালাত মুমিনের জন্য মি'রাজ বা নূর।

قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الصَّلاَةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ–

'রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাত মুমিনের মি'রাজ'।[৪৫]

তাহক্বীক্ব : উক্ত কথার পক্ষে কোন সনদ নেই। এটি ভিত্তিহীন ও বানাওয়াট।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةُ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাত মুমিনের নূর'।[৪৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। মুহাদ্দিছ হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, উক্ত হাদীছের সনদ অত্যন্ত দুর্বল।[৪৭] উক্ত সনদে ঈসা ইবনু মায়সারা নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[৪৮] উল্লেখ্য, ছালাত নূর, ছাদাক্বা দলীল মর্মে ছহীহ মুসলিমে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা সঠিক।[৪৯]

مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا حَجَّ مَعَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَمْسِيْنَ حَجَّةً وَمَنْ صَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ فِي الْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا حَجَّ مَعَ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَرْبَعِيْنَ حَجَّةً أَوْ ثَلاَثِيْنَ إِلَى آخِرِهِ–

'যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করে সে যেন আদম (আঃ)-এর সাথে ৫০ বার হজ্জ করে এবং যে ব্যক্তি যোহরের ছালাত জামা'আতের সাথে পড়ে সে যেন নূহ (আঃ)-এর সাথে ৪০ কিংবা ৩০ বার হজ্জ করে। এভাবেই অন্যান্য ওয়াক্ত সে আদায় করে'।[৫০]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা।[৫১]

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَدَا إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْإِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا

৪৪. দেখুন: শায়খ আলবানী, হুকমু তারিকিছ ছালাহ, পৃঃ ৬।
৪৫. তাফসীরে রাযী ১/২১৪ পৃঃ; তাফসীরে হাক্কী ৮/৪৫৩ পৃঃ; মিরক্বাতুল মাফাতীহ ১/১৩৪ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়।
৪৬. মুসনাদের আবী ইয়ালা হা/৩৬৫৫; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ২৯।
৪৭. তাহক্বীক্ব মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৩৬৫৫।
৪৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৬০।
৪৯. ছহীহ মুসলিম হা/৫৫৬, ১/১১৮ পৃঃ; মিশকাত হা/২৮১।
৫০. হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আছ-ছাগানী, আল-মাওযূ'আত হা/৪৮, পৃঃ ৪২।
৫১. আল-মাওযূ'আত হা/৪৮, পৃঃ ৪২।

إِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيْسَ-

সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের ছালাতের দিকে গেল, সে ঈমানের পতাকা নিয়ে গেল। আর যে ভোরে (ছালাত আদায় না করে) বাজারের দিকে গেল, সে শয়তানের পতাকা নিয়ে গেল।[৫২]

তাহক্বীক্বঃ উক্ত হাদীছের সনদ অত্যন্ত দুর্বল।[৫৩] এর সনদে উবাইস ইবনু মাইমুন নামক রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাকে মুনকার রাবী বলে অভিযোগ করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, সে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নাম দিয়ে ধারণা পূর্বক বহু জাল হাদীছ বর্ণনা করেছে।[৫৪]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللهِ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ قال مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ-

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হ'ল আল্লাহ্র এই বাণী সম্পর্কে- 'নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে'। তখন তিনি বললেন, যাকে তার ছালাত অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার ছালাত হয় না।[৫৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে ইবনু জুনাইদ নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। মুহাদ্দিছগণ বর্ণনাটিকে মুনকার বলেছেন।[৫৬]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللهِ إِلاَ بُعْدًا.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার ছালাত তাকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না তাকে উহা ইসলাম থেকে দূরে সরে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না না।[৫৭]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি বাতিল বা মিথ্যা। এর সনদে লাইছ ইবনু আবী সালীম নামক ক্রটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।[৩৮]

জ্ঞাতব্য : উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে ক্রটিপূর্ণ কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করলে ছালাত কবুল হয় না। সুতরাং ছালাত আদায় করে কোন লাভ নেই। কিন্তু উক্ত ধারণা সঠিক নয়। বরং ছালাত আদায়ের মাধ্যমে এক সময় সে আল্লাহ্র অনুগ্রহে পাপ কাজ ছেড়ে দিবে। ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فُلاَنًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُوْلُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, অমুক ব্যক্তি রাত্রিতে ছালাত আদায় করে আর সকাল হ'লে চুরি করে। তিনি উত্তরে বললেন, ছালাত তাকে অচিরেই তা থেকে বিরত রাখবে।[৩৯]

[চলবে]

৫২. ইবনু মাজাহ হা/২২৩৪, 'ব্যবসা' অধ্যায়, 'বাজার সমূহ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৬৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৯, ২/১৮৯ পৃঃ।
৫৩. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২২৩৪।
৫৪. মিশকাত হা/৬৪০-এর টীকা দ্রঃ।
৫৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৮৫; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৭২।
৫৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৮৫।
৫৭. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৭৩; তাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/১০৮৬২।

৩৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/২, ১/৫৪ পৃঃ।
৩৯. আহমাদ হা/৯৭৭৭; মিশকাত হা/১২৩৭, সনদ ছহীহ।

পলাশীর মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি ও আমাদের শিক্ষা

ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ

কোন জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য না থাকা যেমন দুঃখজনক, তেমনি ইতিহাস থাকার পরও যে জাতি আপন ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞ সে জাতি নিঃসন্দেহে হতভাগ্য। কেননা ইতিহাস শুধু অতীতের ফেলে আসা হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ঘটনাই প্রকাশ করে না; সাথে সাথে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎ চলার পথের প্রেরণার উৎস ও সঠিক দিশা দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি গৌরবময়। অথচ বাঙালী মুসলমানরা আজ তাদের সে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বেমালুম ভুলতে বসেছে।

ভারতবর্ষের বিচিত্র ইতিহাসের মধ্যে পলাশীর মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন মীর জাফর আর জগৎশেঠদের মত এদেশীয় কিছু ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতকের চরম বিশ্বাসঘাতকতায় সুচতুর বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। সাথে সাথে এদেশের আকাশে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা; বাংলার জমিনে নেমে আসে দুর্ভেদ্য অমানিশা; এদেশের মানুষের উপর চেপে বসে পরাধীনতার জগদ্দল পাথর। সেই থেকে সমগ্র ভারতবর্ষ ১৯০ বছর ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তাই প্রতি বছর জুন মাস আসলেই এদেশের স্বাধীনচেতা মানুষের অন্তরে জেগে উঠে পলাশীর আম্রকাননের বিভীষিকা। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, শুরু থেকেই ভারতবর্ষের মুসলমানদের হেয় করার লক্ষ্যে এবং বাঙালী মুসলমান নেতাদের নামে কালিমা লেপনের উদ্দেশ্যে সুস্থ মস্তিষ্কে পলাশীর প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে সে চাপাপড়া ইতিহাস অনেকাংশে স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই নতুন প্রজন্মকে প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই আলোচ্য নিবন্ধে ঐতিহাসিক পলাশীর ট্র্যাজেডি সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব ছিলেন আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০-১৭৫৬)। তাঁর প্রকৃত নাম মীর্জা বন্দি বা মীর্জা মুহাম্মাদ আলী।[৫৮] তাঁর বড় ভাইয়ের নাম হাজী আহমাদ। তাঁদের পিতামহ ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত, আর মাতা ছিলেন আফগান-তুর্কি বংশোদ্ভূত। সেই সুবাদে তাঁরা ছিলেন সুজাউদ্দীন খাঁর আত্মীয়। সুজাউদ্দীন ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী লাভ করেন। এদিকে ১৭০৭ সালে সংঘটিত জজুর যুদ্ধে যুবরাজ আজম শাহ নিহত হ'লে মীর্জা মুহাম্মাদ আলী ও বড় ভাই হাজি আহমাদ নিরুপায় হয়ে আত্মীয় সুজাউদ্দীন খাঁর দরবারে আসেন। সুজাউদ্দীন খাঁ তাঁদের দুই ভাইকে সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত করেন। দুই ভাই সরকারী চাকরী পেয়ে অত্যন্ত দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তাদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সুজাউদ্দীন খাঁ মীর্জা মুহম্মদকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। তখন থেকে মীর্জা মুহম্মদ আলী 'আলীবর্দী খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হন। এরই ধারাবাহিকতায় এক পর্যায় আলীবর্দী খাঁ বিহারের সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (১৭৩৩)। সুজাউদ্দীন খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন মারাঠা ও বর্গীদের লুণ্ঠন দমনের জন্য গভর্ণর আলীবর্দী খাঁ নবাবের অনুমতি প্রার্থনা করলে নবাব সেক্ষেত্রে গুরুত্ব না দেওয়ায় বীর আলীবর্দী খাঁ নবাব সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নবাবকে পরাজিত ও নিহত[৫৯] করে আপন বুদ্ধিমত্তা ও রণকৌশলের বলে বাংলার নবাবী লাভ করেন।[৬০]

নবাব আলীবর্দী খাঁর তিন কন্যা ছাড়া কোন পুত্র সন্তান ছিল না।[৬১] তিনি তাঁর তিন কন্যাকে আপন বড় ভাই হাজী আহমাদের তিন পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন।[৬২] তাঁর তিন জামাতাই তিনটি পর্গনার শাসনকর্তা ছিলেন। একজন ঢাকার, একজন পূর্ণিয়ার এবং ছোট জামাতা জৈনুদ্দীন ছিলেন বিহারের নায়েবে-নাযিম। এদিকে নবাব আলীবর্দী খাঁ কর্তৃক পদচ্যুত সমসের খাঁ ও সরদার খাঁ নামে দুই আফগান বীর বিদ্রোহ করলে তাদেরকে বশ্যতা স্বীকার করার জন্য রাজ দরবারে ডেকে পাঠানো হয়। তারা বশ্যতা স্বীকারের ছলে ১৭৪৮ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী যথাযোগ্য সমাদরে জৈনুদ্দীনের নিকটে উপস্থিত হয়ে অতর্কিতে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। জৈনুদ্দীন নিজ তরবারী কোষমুক্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ছিন্নমুণ্ডু মসনদের উপর লুটিয়ে পড়ে।[৬৩] হাজী আহমাদ বন্দী দশায় নিদারুণ উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে সতের দিনের মাথায় ভগ্নহৃদয়ে বন্দীশালায় মৃত্যুবরণ করেন। সিরাজুদ্দৌলার মাতা ও নবাব আলীবর্দী খাঁর ছোট মেয়ে আমেনা বেগম

---

৫৮. *কে এম. রাইছউদ্দিন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ৯ম সং., ১৯৯৯), পৃঃ ৪৭৬।*

৫৯. *ফারুক মাহমুদ, ইতিহাসের অন্তরালে (ঢাকা : ওয়েসিস বুকস্, ১৯৮৯), পৃঃ ২০৩।*

৬০. *গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস (ঢাকা : মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ২০১০), পৃঃ ১৫৫।*

৬১. *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃঃ ৪৯৩।*

৬২. *তদেব।*

৬৩. *অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সিরাজদ্দৌলা (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০৩), পৃঃ ৩৪।*

সন্তান-সন্ততিসহ আফগান শিবিরে বন্দী হ'লেন।[৬৪] এই মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক সংবাদ পাওয়া মাত্রই নবাব আলীবর্দী খাঁ আফগান বিদ্রোহ দমন এবং তাদের হাত থেকে দুহিতার বন্ধন মোচন করতে বিহারের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যাত্রা করেন। এক্ষেত্রে তিনি পদচ্যুত ও পদগৌরবান্বিত সকল সেনাপতিকে সম্মিলিত করে কাতর কণ্ঠে যখন এই শোকাবহ কাহিনী বর্ণনা করেন, তখন সকলে একে একে কুরআন স্পর্শ করে নাঙ্গা তরবারী হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রাণ-বিসর্জ্জনের শপথ করেন। এ উপলক্ষে পূর্বের সকল কলহ-বিবাদ মিটে গেল, মীরজাফর পুনরায় সেনাপতি পদে নিযুক্ত হ'লেন। সিরাজুদ্দৌলা তখন বয়সে বালক হ'লেও এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় অতিমাত্রায় ব্যাকুল হয়ে উঠেন। কারণ তাঁর পিতা ও পিতামহ শত্রুর হাতে নিহত এবং মাতা বন্দিনী। এমত পরিস্থিতিতে তিনিও তরবারী হাতে মাতামহের সাথে যুদ্ধে যাত্রা করলেন। অতঃপর ১৭৪৮ সালের ১৬ই এপ্রিল গঙ্গার তীরবর্তী কালাদিয়ারা নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াইয়ে বিদ্রোহী সমসের খাঁ নিহত হয় এবং তার সহযোগী বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে আলীবর্দী খাঁ বন্দী কন্যা ও তাঁর সন্তানদের মুক্ত করার মাধ্যমে বিহার পুনরুদ্ধার করেন। নবাব আলীবর্দী খাঁ তখন নিজ স্ত্রী শরফুন্নেসার সাথে পরামর্শ করে নিহত জামাতা জৈনুদ্দীনের সুযোগ্য উত্তরসূরী ও নবাবের প্রিয় দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলাকে বিহারের পরবর্তী নায়েবে-নাযিম নিযুক্ত করেন।[৬৫] এটা ছিল তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার একটা অংশ। যেহেতু সিরাজুদ্দৌলা তখন বয়সে বালক, তাই রাজা জানকীরামকে বিহারে সিরাজের নায়েব নিয়োগ করা হ'ল।[৬৬]

যেহেতু নবাব আলীবর্দী খাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাই তিনি মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র প্রিয় দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলাকে বাংলার পরবর্তী নবাব মনোনীত করে যান।[৬৭] এদিকে হঠাৎ করে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর অন্য এক দৌহিত্র এবং দুই জামাতার (ও ভ্রাতুষ্পুত্র) মৃত্যুতে তিনি খুবই শোকাভিভূত হয়ে পড়েন এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যান। যার ফলে মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে ১৭৫৬ সালের ১০ই এপ্রিল ৮০ বছর বয়সে নবাব আলীবর্দী খাঁ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[৬৮] অবশ্য নবাব আলীবর্দী খাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর তিন জামাতাই মৃত্যুবরণ করেন। নানার মৃত্যুর পর তাঁরই মনোনীত প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেইশ বছর।[৬৯] তাঁর নিকট আত্মীয়ের মধ্যে অনেকেই নবাব আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভের আশায় বুক বেঁধে ছিলেন। তাই তিনি যখন সিরাজুদ্দৌলাকে পরবর্তী নবাব মনোনীত করেন, তখন স্বভাবতই অন্যদের অন্তরে চাপা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। যার ফলে তারা মনে-প্রাণে সিরাজকে নবাব হিসাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই নবাব আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার বিধবা পত্নী মেহেরুন্নেসা ওরফে ঘসেটি বেগম পূর্ণিয়ার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার পুত্র শওকত জঙ্গ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই সুযোগে ধূর্ত বৃটিশ কোম্পানী নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের নিমিত্তে গোপনে শওকত জঙ্গ ও ঘসেটি বেগমের পক্ষাবলম্বন করে। এমনকি নতুন নবাব হিসাবে ইংরেজগণ সিরাজকে উপঢৌকন প্রেরণের চিরাচরিত রীতিও অমান্য করে।[৭০] এ সময় রাজা রাজবল্লভ ঢাকার দেওয়ান ছিলেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা তাকে হিসাব দাখিল করতে বললে সে নবাবের নির্দেশ অমান্য করে নিজ পুত্র কৃষ্ণদাস মারফত প্রচুর ধনরত্নসহ কলকাতায় পাঠায়। এ সংবাদ নবাব সিরাজ জানতে পেরে কৃষ্ণদাসকে গ্রেফতারের আদেশ দিলে ইংরেজরা তাকে আশ্রয় দেয়।

নবাবের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগম, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে যে ইংরেজরাও জড়িত, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। এমতাবস্থায় ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-১৭৬৩) অজুহাতে ইংরেজও ফরাসি বণিকরা বাংলায় দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। নবাব এ সংবাদ জানতে পেরে তাদেরকে নিরস্ত্র হ'তে এবং দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করার আদেশ দেন। ফরাসিগণ নবাবের নির্দেশ মত দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করলেও উদ্ধত বৃটিশ বণিকরা নবাবের আদেশ তো মানেইনি; উপরন্তু তাঁর দূতকে তারা অপমান করতেও দ্বিধা করেনি। এমনকি নবাব কৃষ্ণদাসের সমর্পণ দাবী করলেও তারা তা অমান্য করে। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ কর্মচারী রিচার্ড বেচারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'এটা কি কখনও কল্পনা করা যায় যে, কোন নৃপতির প্রজাকে একদল বিদেশী বণিক আশ্রয় দেবে? কিংবা তাঁর দূতকে অপমানিত করলে রাজা সে অপমান নির্দ্বিধায় মেনে নেবেন? দূতকে ফেরত দেওয়াটা পুরো দুনিয়াতে রাজার অবমাননা বলে মনে করা হবে'।[৭১]

ইত্যবসরে বুদ্ধিমান সিরাজ বিনা রক্তপাতে সুকৌশলে বড় খালা অর্থাৎ ঘসেটি বেগমকে নিজ প্রাসাদে আনতে সমর্থ হন। নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা এভাবে সিরাজের হাতে বন্দী হয়েছে, জানতে পেরে বৃটিশ বণিকেরা ঘসেটি বেগমের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার বিপদ আঁচ

৬৪. *সিরাজদ্দৌলা, পৃঃ ৩৪।*
৬৫. *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃঃ ৪৮১।*
৬৬. *সিরাজদ্দৌলা, পৃঃ ৩৭।*
৬৭. *গোলাম আহমাদ মোর্তজা, ইতিহাসের ইতিহাস, (ঢাকা : মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ২০০৯), পৃঃ ১৮৫।*
৬৮. *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃঃ ৪৮২।*
৬৯. *তদেব, পৃঃ ৪৯৩।*
৭০. *মোঃ আবু তাহের, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পলাশীর ট্রাজেডি (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯), পৃঃ ৮৫।*
৭১. *তদেব, পৃঃ ৮৯।*

করতে পারে। এতে তড়িঘড়ি করে পূর্বের আচরণের জন্য সিরাজের নিকট অনুতাপ প্রকাশ করে। নবাব তখন ইংরেজদেরকে অবিলম্বে দুর্গ নির্মাণ বন্ধ এবং নির্মিত অংশ ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দেন।

এদিকে ঘসেটি বেগমকে রাজদরবারে অন্তরীণ রেখে অপর ষড়যন্ত্রকারী শওকত জঙ্গকে দমনের উদ্দেশ্যে নবাব ১৭৫৬ সালের ১৬ই মে মুর্শিদাবাদ থেকে সসৈন্যে পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হন। ২০শে মে নবাব যখন রাজমহল পৌঁছেন তখন রোজার ড্রেকের পত্র তাঁর হস্তগত হয়। এ পত্রে ড্রেক অত্যন্ত বিনম্র ভাষায় ইংরেজদের সদিচ্ছার কথা জানালেও তাতে দুর্গ নির্মাণ বন্ধ কি-না সে বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় নবাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এতে নবাব পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পূর্ণিয়ার দিকে না গিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে ইংরেজদেরকে উপযুক্ত শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ান হন। পথিমধ্যে তিনি কাশিম বাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করে নিয়ে ১৬ই জুন কলকাতার উপকণ্ঠে পৌঁছেন। যদিও সংবাদ পেয়ে নবাবের গতিরোধ করতে হলওয়েল যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, তথাপি কলকাতাস্থ ইংরেজ ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়াম দখল করতে নবাবকে বেগ পেতে হয়নি। যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়। গভর্নর হলওয়েল আত্মসমর্পণ করেন এবং রোজার ড্রেকসহ অপরাপর ইংরেজরা দুর্গ ত্যাগ করে নদী পথে পলায়ন করে ফুলতায় আশ্রয় নেয়। এমনি পরিস্থিতিতে ২০শে জুন নবাব সিরাজুদ্দৌলা বিজয়ী বেশে কলকাতা দুর্গে প্রবেশ করেন। অতঃপর কলকাতার অভিযান সমাপ্ত করে মাণিক চাঁদের উপর কলকাতার ভার অর্পণ করে নবাব পুনরায় মুর্শিদাবাদ ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে শওকত জঙ্গ নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে মসনদ থেকে অপসারণের লক্ষ্যে যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। এদিকে নবাবও কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ ফিরে এসে শওকত জঙ্গকে দমনের জন্য ১৭৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে সসৈন্যে পূর্ণিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। ১৭৫৬ সালের ১৬ই অক্টোবর নবাবগঞ্জের মনিহারী গ্রামে দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে শওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হন।[৭২] ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ঘসেটি বেগম, ইংরেজ ও শওকত জঙ্গের মত তিনটি প্রধান ষড়যন্ত্রকারীকে কঠোর হস্তে মোকাবেলা করতে সমর্থ হন।

এদিকে নবাব কর্তৃক কলকাতা অধিকারের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছলে বৃটিশ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কলকাতা পুনরুদ্ধারে বেরিয়ে পড়েন। একই সাথে এডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে এক নৌবহরও কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। প্রথমে তারা ফুলতায় এসে বিনা বাধায় উদ্বাস্তু ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়। অতঃপর সম্মিলিতভাবে কলকাতার দিকে যাত্রা করে। মানিক চাঁদের নেতৃত্বে কিছু সৈন্য অতর্কিতে তাদের উপর হামলা চালালে ইংরেজদের বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু অর্থের প্রলোভনে শেষ পর্যন্ত মানিক চাঁদ ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে পালিয়ে যান। এই সুযোগে ইংরেজরা নবাবের বজবজ দুর্গ ধ্বংস করে এবং ১৭৫৭ সালের ২রা জানুয়ারী কলকাতা অধিকার করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সুরক্ষিত করে। এক্ষেত্রে মানিক চাঁদ গোপনে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করে চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয়। অথচ কলকাতা পতনের পর যদি উমিচাঁদ, নবকিষেণ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, মানিক চাঁদের মত হিন্দু-প্রধানরা রজার ড্রেক, হলওয়েল, ক্লাইভ, ওয়াটসনদের সাহায্য না করত, তাহ'লে ইংজেদের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

কলকাতা অধিকার করেই ইংরেজরা পরের দিন ৩রা জানুয়ারী নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অপর দিকে নবাবও এ সংবাদ জানতে পেরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইতিমধ্যে ক্লাইভ ১০ই জানুয়ারী হুগলী অধিকার করে শহর লুণ্ঠন করে এবং পার্শ্ববর্তী বহু গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। ১৯শে জানুয়ারী নবাব হুগলী পৌঁছলে ইংরেজরা পিছু হটে কলকাতায় প্রস্থান করে। ৩রা ফেব্রুয়ারী নবাব কলকাতার শহরতলীতে উমিচাঁদের বাগানে শিবির স্থাপন করলে ৫ই ফেব্রুয়ারী শেষ রাতে ক্লাইভ ও ওয়াটসন অকস্মাৎ নবাব শিবিরে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে নবাবের পক্ষের প্রায় ১৩০০ সৈন্য হত্যা করে। কিন্তু সকালেই নবাবের সৈন্য সুসজ্জিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালালে ক্লাইভ প্রস্থান করে। সেদিন কলকাতা জয়ের মত নবাবের যথেষ্ট সৈন্য ও শক্তি থাকার পরও ৯ই ফেব্রুয়ারী'৫৭ সেনাপতির পরামর্শে ও ষড়যন্ত্রে নবাব ইংরেজদের সাথে এক অপমানজনক সন্ধি স্থাপনে সম্মত হন। যে সন্ধি 'আলিনগর সন্ধি' নামে অভিহিত হয়।[৭৩] এই সন্ধির ফলে নবাবের প্রতিপত্তি অনেকাংশে হ্রাস পায় এবং ইংরেজের শক্তি, প্রতিপত্তি ও ঔদ্ধত্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে ইংরেজদের পক্ষে কাজ করেন বঙ্গের বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠ, কলকাতার বড় ব্যবসায়ী উমিচাঁদ ও রাজা রাজবল্লভ, মানিক চাঁদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এ ঘটনায় ইংরেজদের মনোবলও বৃদ্ধি পায়। ফলে ২৩শে এপ্রিল'৫৭ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিল নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৭৪] এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মে'৫৭-র প্রথম সপ্তাহে মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের বাড়িতেই উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, মীরজাফর প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের এক গোপন বৈঠক

৭২. *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃঃ ৪৯৬।*

৭৩. *মুহাম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪), পৃঃ ৯।*

৭৪. *ইতিহাসের অন্তরালে, পৃঃ ১৫৭।*

অনুষ্ঠিত হয়।[৭৫] উক্ত ষড়যন্ত্রমূলক গোপন বৈঠকে কলকাতা থেকে কোম্পানীর দূত হিসাবে ওয়াটসনকে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে পালকীতে করে আনা হয়।[৭৬]

বৈঠকে বসে ওয়াটসন প্রথমে সকলকে প্রলোভনের জালে আঁটকে ফেলে। অতঃপর সিরাজুদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুত করার কথা সুকৌশলে ব্যক্ত করে। ওয়াটসন আরো বলে, নবাব ক্ষমতাচ্যুত হ'লে সারা ভারতের মুসলমানদের উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে তাঁরই আত্মীয় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাতে হবে। মীরজাফর প্রথমে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি ছিলেন পরলোকগত নবাব আলীবর্দী খাঁর ভগ্নীপতি এবং বাংলার সিপাহসালার। তিনি সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক ক্রমাগত অপমানিত ও পদচ্যুত হ'লেও নিজে কখনো সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার কল্পনাও করেননি। তিনি বলেন, 'আমি নবাব আলীবর্দী খাঁর আত্মীয়, অতএব সিরাজও আমার আত্মীয়, এটা কি করে সম্ভব?' তখন উমিচাঁদ বললেন, 'আমরা তো আর সিরাজকে মেরে ফেলছি না অথবা আমরা নিজেরাও নবাব হচ্ছি না, শুধু তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে বসাতে চাচ্ছি। কারণ শুধু আমি নই, ইংরেজ এবং মুসলমানদের অনেকেই, এক কথায় অমুসলমানদের প্রায় প্রত্যেকেই আপনাকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে'।[৭৭] এরপরও যখন দেখলেন, তিনি রাজি না হ'লে তারা নবাবকে হটিয়ে সেখানে ইয়ার লতিফকে বসানোর ষড়যন্ত্র করছে; তখন তিনি আর উদাসীন না থেকে তাদের প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন। তখন ওয়াটসন বলেন, এই মুহূর্তে সিরাজের সাথে লড়তে গেলে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা আমাদের নেই। তখন জগৎশেঠ বলেন, 'টাকা যা দিয়েছি আরও যত দরকার আমি আপনাদের দিয়ে যাব, কোন চিন্তা নেই, আপনারা প্রস্তুতি নিন'।[৭৮] তখন উপস্থিত দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে শুধু নবাব বিরোধী নয়, সাথে সাথে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী একটি সন্ধিপত্র রচিত হয়। উক্ত সন্ধিপত্রে ওয়াটসন ১৯শে মে স্বাক্ষর করলেও মীরজাফর স্বাক্ষর করেন ৪ঠা জুন।

এবার রবার্ট ক্লাইভ সামান্য অজুহাতে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নবাবও ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে সসৈন্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন প্রাতঃকালে ভাগীরথীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। নবাবের সৈন্য সংখ্যা ৫০ হাজার, অপর দিকে ইংরেজ সৈন্য সংখ্যা মাত্র ৩ হাজার। মীরজাফর ও রায়দুর্লভদের চক্রান্তে নবাবের সৈন্যের একটা বড় অংশ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। কেবল মীর মদন, মোহনলাল ও সিনফ্রের অধীনে মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। মীরমদন ও মোহনলালের সমরকুশলতার সম্মুখে ইংরেজ বাহিনী টিকতে না পেরে ক্লাইভের সৈন্য বাহিনী পার্শ্ববর্তী আম্রকাননে আশ্রয় নেয়। নবাব বাহিনীর জয় যখন সুনিশ্চিত, ঠিক সেই মুহূর্তে মীরমদন নিহত হন। অনন্যোপায় হয়ে নবাব তখন মীরজাফরের শরণাপন্ন হন। তিনি আলীবর্দী খাঁর আমলের আনুগত্যপূর্ণ ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজ উষ্ণীষ মীরজাফরের সম্মুখে নিক্ষেপ করে বললেন, 'জাফর খাঁ, এই উষ্ণীষের সম্মান রক্ষা করুন'।[৭৯]

তখন মীরজাফর মুখে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও তলে তলে সবচেয়ে বড় সর্বনাশটাই করলেন। তিনি সিরাজকে যুদ্ধ বিরতির আত্মঘাতী পরামর্শ দিলেন। অথচ মীর মদনের মৃত্যুর পর মোহনলালের প্রচেষ্টায় যুদ্ধের গতি নবাবের অনুকূলেই ছিল। কিন্তু নিজ অদূরদর্শিতা ও মীরজাফরের সর্বনাশা পরামর্শে তিনি মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেন। প্রথমে মোহনলাল তাঁর আদেশ মানেননি। কিন্তু নবাবের নিকট থেকে পুনঃ পুনঃ আদেশের ফলে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করেন। এই সুযোগে রবার্ট ক্লাইভ পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে নবাব বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। নবাব পালিয়ে গিয়ে কোনক্রমে প্রাণে রক্ষা পান। যুদ্ধক্ষেত্রেই রবার্ট ক্লাইভ মীরজাফরকে নতুন নবাব বলে অভিনন্দন ও কুর্নিশ করে।[৮০] ২৬শে জুন তাঁর অভিষেক হয় এবং ২৯শে জুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা রাজধানীতে ফিরে এসে প্রচুর অর্থ বিতরণ করে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি স্বীয় পত্নী ও কন্যাসহ পালিয়ে যান। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস পথিমধ্যে রাজমহলে রাত কাটাতে গিয়ে ৩০শে জুন তিনি ধরা পড়েন।

২রা জুলাই রাতে সাধারণ বন্দীর মত শৃঙ্খলিত অবস্থায় সিরাজুদ্দৌলাকে নতুন নবাব মীরজাফরের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। ঐ রাতেই মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে মুহাম্মাদী বেগ তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

নবাবকে হত্যা করতে মুহাম্মাদী বেগ রাযী না হ'লে তারা তার ও তার স্ত্রী-পুত্রের প্রাণনাশের হুমকী দেয়। অনন্যোপায় হয়ে অশ্রু সম্বরণ করে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিকল্পনামাফিক সংকেত পাওয়া মাত্র সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা করতে সম্মত হন। মুহাম্মাদী বেগ যখন উলঙ্গ তরবারী নিয়ে রাতে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করেন, তখন নবাবের আর বুঝতে বাকি ছিল না, তাঁর মৃত্যুর সময় সমাগত। তখন তিনি কাতর কণ্ঠে বললেন, 'মুহাম্মাদী বেগ, আমাকে কি তোমরা সামান্য একটা অসহায় গরীবের মত বেঁচে থাকতেও দেবে না?' তখন মুহাম্মাদী বেগও

৭৫. তদেব।
৭৬. চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ১৫৫।
৭৭. তদেব, পৃঃ ১৫৬।
৭৮. তদেব, পৃঃ ১৫৫।
৭৯. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃঃ ৫০১।
৮০. তদেব।

দৃঢ়ভাবে বললেন, 'না তারা তা দেবে না'। তখন নবাব মুহাম্মাদী বেগকে বলে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে ছালাত শেষ হওয়ার আগেই দূর থেকে বাঁশি বাজিয়ে সংকেত দেওয়া মাত্র তাঁর উপরে তরবারী চালানো হয়। নবাব সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটে পড়ে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' শব্দ করতে করতে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিলেন।[৮১] এটাই হল পলাশীর প্রান্তরের নির্মম ট্র্যাজেডি।

বাহ্যিকভাবে নবাব সিরাজুদ্দৌলার চরম পরিণতির জন্য শেষ দিকের কিছু ঘটনাবলীর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কয়েকজন বিশ্বাসঘাতককে দায়ী করা হ'লেও মূলতঃ পলাশীর বিয়োগান্ত ঘটনা কোন কাকতালীয় বিষয় ছিল না। এটি ছিল বৃটিশ বেনিয়াদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিণতি। প্রথম থেকেই যদি জগৎশেঠের মত এদেশের নামী-দামী ধনাঢ্য এবং পরবর্তীতে ক্ষমতালোভী কিছু মীরজাফরা ইংরেজদের সহযোগিতা না করত, তাহ'লে কোন দিনই ইংরেজরা এদেশের মানুষদেরকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে সমর্থ হ'ত না। বাংলার এসব বিশ্বাসঘাতকরা কখনই উপলব্ধি করতে পারেনি যে, নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয় শুধু তাঁর একার পরাজয় নয়, শুধু বাংলার পরাজয় নয়, বরং সমগ্র ভারতবাসীর পরাজয়। তবে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানেই, অতি সহজেই তারা এই চরম সত্য বিষয়টি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে মীরজাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে শেঠজীদের বিশ্বাসভাতকতায় ইংরেজরা বহুগুণ বেশী উপকৃত হয়েছিল। তারা শুধু পলাশীর যুদ্ধেই নয়, বহু আগে থেকেই ইংরেজদের নানাভাবে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে আসছিল। একারণেই ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও এই বিরাট সত্যটা অকপটে স্বীকার করেছেন, The rupees of the Hindu banker equally with the sword of the English Colonel contributed to the over through of the Mahamedan power in Bengal. 'বাংলায় মুসলমানদের শক্তিকে খর্ব করে পরাধীন করতে বৃটিশ তরবারীর সাথে হিন্দু ধনপতিদের অর্থভাণ্ডারও সমানভাবে সহযোগিত করেছিল'।[৮২] শেঠরা শুধু ইংরেজদেরকেই টাকা দেয়নি, সিরাজুদ্দৌলার অনেক সৈন্যকে পর্যন্ত অর্থ দিয়ে নিষ্ক্রীয় রেখে বাংলার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। আরো দুঃখের কথা হ'ল বন্দী সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা করার প্রস্তাব এই জগৎশেঠই দিয়েছিল।[৮৩] এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের চিরন্তন ঘোষণা বাস্তবে প্রতিফলিত হ'ল। বিধর্মীদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ. 'মুমিনগণ যেন মুমিন ছাড়া কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না' *(আলে ইমরান ২৮)*। অর্থাৎ একজন বিধর্মী কোন দিনই কোন মুসলমানের প্রকৃত বন্ধু হ'তে পারে না। সুতরাং তাদের থেকে সর্বদা সর্তক থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

পলাশীর পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসন ও আধিপত্যের অবসান ঘটে। এর মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে ভারতের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ফলে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নতুন নবাব বৃটিশ বেনিয়াদের হাতের পুতুলে পরিণত হওয়ায় এ রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক কে? এই প্রশ্নে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক কথায় বাংলায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ শূন্যতার উদ্ভব হয়, যা বাংলার জনগণের জন্য এক মারত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিশেষে বলা যায়, নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যেরূপে এদেশের হিন্দু ধনিক শ্রেণীকে হাত করার পাশাপাশি স্বার্থান্বেষী মুসলমানদের মিথ্যা প্রলোভনে কাবু করে ছিল, আধুনিক বিশ্বেও সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে সকল দিকে থেকে কোণঠাষা করতে ইসলাম বিরোধী পরাশক্তিগুলো যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই মুসলমানদের সময় এসেছে পলাশীর মর্মান্তিক পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের। মহান আল্লাহ আমাদের সে তাওফীক দান করেন- আমীন!!

৮১. অক্ষয় কুমার মৈত্র, সিরাজুদ্দৌলা ও পুরানা কলকাতার কথাচিত্র (কলকাতা : ১৮৯৮), পৃঃ ৩৯৩।
৮২. চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ১৫৮।
৮৩. তদেব।

ফৎওয়া : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ

*শিহাবুদ্দীন আহমাদ**

(২য় কিস্তি)

ছাহাবায়ে কিরামের যুগে ফৎওয়া :

রাসূল (ছাঃ)-এর অবর্তমানে তাঁরই একনিষ্ঠ ছাহাবীগণ ইসলামী শরী'আতের ধারক-বাহক, সংরক্ষক ও প্রচারক হিসাবে দায়িত্বপালন করবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যার জন্য রাসূল (ছাঃ) তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে তোলেন। খোলাফায়ে রাশিদুনও এভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন। যেমন ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একদা তিনি শুরাইহ (রাঃ)-কে বললেন,

اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون-

'যা আছে আল্লাহ্র কিতাবে তা দিয়ে মীমাংসা করবে। আর যদি আল্লাহ্র কিতাবে সে বিষয়টি না থাকে, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত দ্বারা মীমাংসা করবে। আর যদি সে বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতেও না পাও তাহ'লে তোমার পূর্বসূরী সৎকর্মশীল মুহাক্কিক্ব আলেমদের মতামত অনুযায়ী মীমাংসা করবে'।[৮৪]

রাসূল (ছাঃ)-এর পর ফৎওয়া প্রদানের দায়িত্বভার তাঁরই ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞ ও যোগ্য ছাহাবীদের উপর অর্পিত হয়। আছহাবে কিরামের মধ্যে যাঁরা ফৎওয়া প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে ১৩০ জনের কিছু বেশী ছিল। তাঁদের মধ্যে আবার কয়েকটি স্তর রয়েছে। সবচেয়ে বেশী ফৎওয়া প্রদানকারী ছাহাবার সংখ্যা সাত জন। তাঁরা হ'লেন- ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ), আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ), উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ), যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)। তাঁদের সকলেই এত বেশী ফৎওয়া প্রদান করেছেন যে, তা একত্রিত করলে বিরাট বিরাট পাণ্ডুলিপি হয়ে যাবে।[৮৫] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ফৎওয়া পরবর্তীতে (আব্বাসীয় যুগে) একত্রিত করলে তা বিশটি গ্রন্থে পরিণত হয়।[৮৬]

আছহাবে কেরামের মধ্যে যাঁরা ফৎওয়া প্রদানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন, তাঁদের উল্লেখযোগ্য হ'লেন- আবু বকর, উম্মে সালামা, আনাস বিন মালিক, আবু সাঈদ খুদরী, ওছমান ইবনু আফফান, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের, আবু মূসা আল-আশ'আরী, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ, সালমান ফারেসী, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, মু'আয ইবনু জাবাল, তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ, ইমরান ইবনু হুসাইন, আবু বাকরাহ, উবাদা বিন ছামিত এবং মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রাঃ) প্রমুখ।

যে সকল ছাহাবী অল্প সংখ্যক ফৎওয়া প্রদান করেছেন তাঁরা হ'লেন- আবু দারদা, আবুল ইয়াসার, আবু সালামা আল-মাখযূমী, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, সাঈদ বিন যায়েদ, হাসান, হুসাইন, নু'মান ইবনু বাশীর, আবু মাসঊদ, উবাই কা'ব, আবু আইয়ূব, আবু তালহা, আবু যর আল-গিফারী, উম্মে আতিয়্যাহ, ছাফিয়া, হাফছা, উম্মু হাবীবাহ, উসামাহ বিন যায়েদ, জা'ফর ইবনু আবী তালিব ও বারা ইবনু আযিব (রাঃ) প্রমুখ।[৮৭]

উল্লেখিত ছাহাবাগণ ছাড়াও একেবারে কম সংখ্যক ফৎওয়া প্রদান করেছেন কিছু ছাহাবী যাদেরকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

তাবেঈদের যুগে ফৎওয়া :

ছাহাবায়ে কেরামের যুগ রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ১১ হিজরী হ'তে প্রায় ৯৩ হিজরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর পর থেকে তাবেঈদের যুগ শুরু হয়।

এ যুগে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত বিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে শারঈ বিধানও প্রচার ও প্রসার লাভ করে। স্থান, কাল, পাত্র এবং জাতি, বর্ণ ও গোত্র ভেদে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত ফৎওয়া ব্যতীত নানামুখী ফৎওয়া বা যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব-এর প্রয়োজন দেখা দেয়। এসব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের দীর্ঘকাল পর তাবেঈদের যুগে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে ইসলামী শরী'আতের আরকান, আহকাম, শর্তসমূহ ও অন্যান্য আদব সমূহ পৃথক আকারে সুবিন্যস্ত হয়। এর ফলে কোনটি ফরয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত এবং কোনটি মুস্তাহাব- এসব কিছু বের করা সহজ হয়। যা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এবং

* পিএইচ.ডি. গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৮৪. ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন, ১ম খণ্ড, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩ খৃঃ/১৪১৪হিঃ), পৃঃ ১০।

৮৫. মুফতী তাকী ওছমানী, উছূলুল ইফতা, পৃঃ ২৪।

৮৬. ঐ, পৃঃ ২৫।

৮৭. ঐ, পৃঃ ২৬।

ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। কেননা আছহাবে কেরাম কোন রূপ ব্যাখ্যা ও আলোচনা ব্যতিরেকে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে গ্রহণ করেছেন। শারঈ হুকুম-আহকামকে কখনও সুবিন্যস্ত বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁরা ফৎওয়া দিতেন কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই। কারণ তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ শারঈ ইলম বিদ্যমান ছিল। তাঁদের অবর্তমানে তাঁদেরই উত্তরসূরী তাবেঈগণ ফৎওয়া প্রদানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তবে খুবই অল্প সংখ্যক তাবেঈ ফৎওয়া প্রদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টা করতেন পবিত্র কুরআন ও হাদীছে উল্লেখ রয়েছে এমন বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কথা না বলতে। তাঁরা ছোট-খাট মাসআলার সমাধানে ফৎওয়া প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। কারণ ক্বিয়াস ও নিজস্ব মতামত দ্বারা কোন বিষয়ে ফৎওয়া দিতে তাঁরা ভয় পেতেন। তবে যতটুকু প্রয়োজন শুধুমাত্র ততটুকুরই সমাধান দিতে চেষ্টা করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ওযূর সুন্নাত, মুস্তাহাব, ওয়াজিব কোনটাই উল্লেখ ছিল না, এটা পরবর্তীতে (তাবেঈ যুগে) নির্ণিত হয়েছে।

স্থানভেদে উল্লেখযোগ্য কতিপয় তাবেঈর নাম উল্লেখিত হ'ল-

মদীনা : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আবু সালামাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ, উরওয়াহ ইবনু যুবাইর, উবায়দুল্লাহ, কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ, সুলায়মান বিন ইয়াসার, খারেজাহ বিন যায়েদ, ইমাম যুহরী (মৃত্যু ১১৪ হিঃ), কাযী ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, রবী'আহ ইবনু আব্দুর রহমান (রহঃ) প্রমুখ।

মক্কা : আত্বা ইবনু আবী রাবাহ (রহঃ), আলী ইবনু আবী তালহা, আব্দুল মালিক ইবনু জুরাইজ (রহঃ) (মৃত্যু ১৫০ হিঃ), মুজাহিদ বিন জাবর, উবাইদ বিন উমাইর, আমর ইবনু দীনার, আব্দুল্লাহ বিন আবী মুলায়কা, আব্দুর রহমান বিন সাবেত্ব, ইকরিমা (রহঃ) প্রমুখ।

কুফা : ইবরাহীম আন-নাখঈ (মৃত্যু ৯৬ হিঃ), আমের ইবনু শারাহীল আশ-শা'বী, আলকামা ইবনু কায়েস আন-নাখঈ (মৃত্যু ৬২ হিঃ), আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ, মুররা ইবনু শারাহীল আল-হামাদানী (রহঃ) প্রমুখ।

বসরা : আমর ইবনু সালামাহ আল-জারমী, আবু মারইয়াম আল-হানাফী, কা'ব ইবনু সাওদ, হাসান বসরী, আবু শা'ছা, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন, আবু ক্বিলাবা আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ আল-জারমী, মুসলিম বিন ইয়াসার, আবুল আলিয়া, হুমায়দ ইবনু আব্দুর রহমান, মুত্বাররিফ বিন আব্দুল্লাহ আশ-শিক্ষীর, যুরারাহ বিন আবী আওফা, আবু বুরদাহ বিন আবী আওফা (রহঃ) প্রমুখ।

ইয়ামান : আউস ইবনে কাইসান, ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ, ইয়াহইয়া ইবনু কাছীর, মুতাররিফ ইবনু মাযেন, আব্দুর রাযযাক ইবনু হুমাম, হিশাম ইবনু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনু ছাওর ও সিমাক ইবনুল ফযল (রহঃ) প্রমুখ।

সিরিয়া : মাকহূল ইবনু আবী মুসলিন, আল-হুযালী (মৃত্যু ১৯৩ হিঃ), আবু ইদরীস আল-খাওলানী, শুরাহবীল ইবনু আস-সামাত, আব্দুল্লাহ আবি যাকারিয়া আল-খুযাঈ, কাবীছাহ ইবনু আবী যুওয়াইব আল-খুযাঈ, হিব্বান ইবনু উমাইয়া, সুলাইমান ইবনু হাবীব আল-মুহারিবী, হারিছ ইবনু উসাইর যুবাইদী, আব্দুর রহমান ইবনু জুবাইর, ওমর ইবনু আব্দুল আযীয, রাজা ইবনু হায়াত (রহঃ) প্রমুখ।[৮৮]

মিসর : ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব, বুকাইর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনিল আশাজ্জ, আমর ইবনিল হারেছ (রহঃ) প্রমুখ।

স্পেন : ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, আব্দুল মালেক ইবনু হাবীব, বাক্বী ইবনু মাখলাদ, কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ, মাসলামা ইবনু আব্দুল আযীয আল-কাযী, মুনযির ইবনু সাঈদ (রহঃ) প্রমুখ।

বাগদাদ : এখানে বহু মুফতীর সমাগম ঘটেছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবনু সাল্লাম, আবু ছাওর ইবরাহীম ইবনু খালেদ আল-কালবী, যিনি ইমাম শাফেঈর শাগরেদ ছিলেন।[৮৯]

উল্লেখ্য যে, তাবেঈদের অধিকাংশ ফৎওয়া সংকলিত হয়েছে মুয়াত্ত্বা, মুসনাদ ও সুনান কিতাব সমূহ, মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল আছার প্রভৃতি গ্রন্থে।[৯০]

আব্বাসীয় যুগ :

ওছমান (রাঃ)-এর যুগ পর্যন্ত ফৎওয়া প্রদানের মূল দায়িত্ব পালন করতেন খুলাফায়ে রাশেদীন। অবশ্য মুজতাহিদগণ ইজতেহাদ করতেন। কিন্তু তাঁদের মতবিরোধ কোন অনিষ্টকর রূপ পরিগ্রহ করত না। কারণ প্রত্যেক মুজতাহিদের এলাকা ছিল ভিন্ন। এরপর আসে উমাইয়া যুগ। তাদের যুগে খিলাফতের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল রাজ্য জয়ের দিকে। মুজতাহিদ-ফক্বীহদের অবস্থাও প্রায় পূর্বের ন্যায়ই ছিল। রাজ্যের মধ্যে কোন ফৎওয়ায় মতবিরোধ দেখা দিলে তা নিয়ে বিরুদ্ধ অবস্থা তৈরী হ'ত না। আর রাজধানীতে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে, তা খলীফা নিজেই সমাধান করতেন। আবার খলীফা যখন কোন বিরোধ মীমাংসায় অক্ষম হ'তেন, তখন মদীনার ফক্বীহগণের শরণাপন্ন হ'তেন এবং তাদের ফায়ছালা গ্রহণ করা হ'ত। উল্লেখ্য যে, উমাইয়া শাসকগণ ইসলামের

৮৮. উছূলুল ইফতা, পৃঃ ২৮-৩১; ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/২৩ পৃঃ।
৮৯. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/২২ পৃঃ।
৯০. উছূলুল ইফতা, পৃঃ ৩১।

জ্ঞানকেন্দ্রকে দামেশকে স্থানান্তরিত করেননি; বরং তাঁরা মদীনাকেই উৎস মনে করতেন।[৯১]

কিন্তু আব্বাসীয় শাসকগণ বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করার সাথে শিক্ষাকেন্দ্রও সেখানে নিয়ে যান। সুতরাং আব্বাসীয় আমলে মদীনার পরিবর্তে বাগদাদই হয়ে ওঠে ইসলামী জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র। আব্বাসীয় খলীফাদের কারো মধ্যে মুফতী-ফক্বীহ ও মুজতাহিদদের বিভিন্ন মতামত বিচার করে কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যোগ্যতা ছিল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমস্ত প্রশ্ন কেন্দ্রে এসে জমা হ'ত এবং সেসব মাসআলা নিয়ে ফক্বীহদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত। এমতবস্থায় খলীফার প্রয়োজন ছিল এমন অভিজ্ঞ মুফতী, মুজতাহিদ বিদ্বান লোকের, যিনি সর্বদা তাঁর সন্নিধানে থাকবেন এবং মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার সীমাংসা করতে সক্ষম হবেন। খলীফা আল-মনছূর এজন্য প্রথম দিকে মদীনার মুফতীদেরকে নিজের পক্ষভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সহযোগিতা লাভে তিনি অসমর্থ হন। অতঃপর খলীফা ইরাকবাসী ফক্বীহ-মুফতীদের শরণাপন্ন হন। তিনি ইমাম আবু হানীফার সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফাও তাঁকে নিরাশ করেন। অবশেষে ইমাম আবু ইউসুফ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানীফার ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে সর্বত্র একটি কার্যবিধি বা আইন প্রণয়ন করেন এবং ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বানীর উপর আইন শিক্ষাদানের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। তখন বিষয়টি দাঁড়াল এই যে, ইমাম মুহাম্মাদের কাছে শিক্ষালাভের পর যারা বের হ'তেন, তাঁরাই শুধু রাষ্ট্রীয় কাযীর পদের যোগ্য বিবেচিত হ'তেন এবং তাঁরাই সেখানে নিযুক্ত হ'তেন। এই কাযীগণ আবার তাঁদের ছাত্রদেরকে বাছাই করে অধঃস্তন কাযীর পদের জন্য নির্বাচন করতেন। এভাবে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর মাধ্যমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যভুক্ত সমগ্র মুসলিম জাহান একই ধরনের আইনের আওতায় চলে আসে।[৯২] এ পর্যায়ে আব্বাসীয় শাসনামলের স্বর্ণযুগ সূচিত হয়েছিল। যেখানে সমগ্র মুসলিম জাহানব্যাপী যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব ইমাম আবু হানীফার ইজতিহাদ অনুযায়ী প্রদান করা হ'ত। সুতরাং আহলুর রায় তথা হানাফী মাযহাবের বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এ যুগেই।

এভাবে আব্বাসীয় যুগ শুরু হওয়ার পর ফক্বীহদের ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে আহলুর রায় এবং আহলুল হাদীছ– এ দু'টি ধারা সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি ধারা তথা আহলুর রায় বলতে তাদেরকে বুঝানো হ'ত যারা ছিলেন মূলতঃ ইমাম আবু হানীফার ইজতিহাদের অনুসারী। যেহেতু ইমাম আবু হানীফা ফৎওয়া প্রদানে হাদীছের চেয়ে রায়ের উপর অধিক নির্ভর করেছেন। তাই তাঁর অনুসারীদেরকে আহলুর রায় বলা হয়। কূফা এবং এতদঞ্চল জুড়েই ছিল তাদের উপস্থিতি।

অপরদিকে এর বিপরীতে মদীনা তথা হেজায অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃতি লাভ করে আহলুল হাদীছ তথা হাদীছপন্থীগণ। যারা ফৎওয়া প্রদানে মূলতঃ হাদীছের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। যেহেতু সর্বক্ষেত্রে তাঁরা হাদীছকেই একমাত্র প্রণিধানযোগ্য মনে করতেন। তাই তাদেরকে আহলুল হাদীছ বলা হয়। তাঁরা মাসআলার ক্ষেত্রে কূফী, বাগদাদীদের রায়ভিত্তিক ফৎওয়া গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না এবং তারা এর কঠোর সমালোচনা করতেন।[৯৩]

এ দু'টি ধারার বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

(১) আহলুর রায় : ইরাকবাসী আহলুর রায়পন্থী ফক্বীহগণ ফৎওয়া প্রদানে হাদীছের চেয়ে রায়ের প্রতিই বেশী নির্ভরশীল ছিলেন। কারণ হেজাযের ফক্বীহদের চেয়ে তাদের সংগৃহীত হাদীছের সংখ্যা ছিল অনেক কম। কেননা সেখানে গমনকারী ছাহাবীদের সংখ্যা কম ছিল। আর ইরাক ছিল পারসিক সভ্যতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে সেখানে নানাবিধ সমস্যার উপস্থিতি ছিল অনেক বেশী, যাতে ফৎওয়া প্রদানে নিজস্ব যুক্তি ও কিয়াসের ব্যবহার করার প্রয়োজন হ'ত। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, 'আমি একটি হাদীছ শুনি, আর তার উপর আরো একশটি মাসআলা কিয়াস করি'।[৯৪] এছাড়াও শী'আ ও খারেজীদের উৎপাত এবং রাজনৈতিক দলাদলির তীব্রতায় জর্জরিত ছিল ইরাক। আপন আপন স্বার্থে এসব দল-উপদল রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে নিয়েও ছেলেখেলা শুরু করে এবং স্ব স্ব মতের অনুকূলে লক্ষ লক্ষ জাল হাদীছ তৈরী করা আরম্ভ করে। ফলে হাদীছ জাল বা মিথ্যা হওয়ার আশংকায় এখানকার ফক্বীহগণ হাদীছ সংরক্ষণ ও রেওয়ায়াত করতেন খুব কম। তাই ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে হাদীছের চেয়ে রায়ের উপরই তারা ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, তারা শরী'আতের আহকাম বর্ণনায় হাদীছের উদ্ধৃতি দিতে ভয় পেতেন, অথচ রায়

৯১. মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯২), পৃঃ ১৫৮-১৫৯।
৯২. শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, পৃঃ ১৫৯-১৬০।
৯৩. মান্না আল-কাত্ত্বান, আত-তাশরীঈ ওয়াল ফিক্বহ ফিল ইসলাম (কায়রো : মাকতাবা ওহাবাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৩), পৃঃ ২৯৩।
৯৪. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৮হিঃ), ২/৬৬ পৃঃ।

উল্লেখ করতেন নির্ভয়ে।[৯৫] এই মাসলাকের ফক্বীহগণের মধ্যে ইবনু আবী লায়লা, ইবনু শুবরামাহ, শুরায়েক আল-কাযী, ইমাম আবু হানীফা প্রমুখ নেতৃত্বে ছিলেন।[৯৬]

(২) আহলুল হাদীছ : হেজাযবাসী আহলুল হাদীছ তথা হাদীছপন্থী ওলামায়ে কেরাম ছিলেন কঠোরভাবে হাদীছের অনুসারী। কেননা তাঁরা ছিলেন অহি-র অবতরণস্থল এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের কেন্দ্রভূমির অধিবাসী। সেখানেই বসবাস করেছেন অধিকাংশ ছাহাবীগণ। ফলে রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ ও ছাহাবাগণের আছারের উপরই ছিলেন তারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। যায়েদ বিন ছাবিত, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী, সাঈদ বিন মুসাইয়িবের মত তাবেঈগণ ছিলেন তাঁদের নেতৃত্বে। ফলে হাদীছ ও আছারের যথেষ্ট উপস্থিতি থাকায় তাদেরকে সাধারণতঃ ব্যক্তির রায়ের অপেক্ষা করতে হ'ত না। তদুপরি এখানকার ফক্বীহগণ হাদীছের বিপরীতে নিজস্ব রায় প্রদানের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন। তাঁরা কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'লে সে বিষয়ে কোন আয়াত বা হাদীছ পেলে সে প্রশ্নের উত্তর দিতেন, অন্যথা ফৎওয়া প্রদানে বিরত থাকতেন। তারা বিশেষতঃ ইরাকের ফক্বীহদের হাদীছের পরিবর্তে রায়ের উপর নির্ভরতাকে খুব সমালোচনার চোখে দেখতেন।[৯৭] এই ধারায় পরবর্তীতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ)।[৯৮]

ফৎওয়া প্রদানে ক্রমশঃ এ দু'টি স্বতন্ত্র ধারা স্পষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ফক্বীহদের পারস্পরিক মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্বের বিষয়টিও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর লাগল। ইলমের চর্চাকেন্দ্রসমূহে নেতৃত্বদানকারী চারজন মুজতাহিদ ইমাম যাঁদের দিকে মাযহাবগুলো সম্বন্ধ করা হয়; ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ– তাঁরা এই সময়ই তাঁদের কর্মময় জীবনকাল অতিবাহিত করেন।

হিজরী ২য় শতকের মাঝামাঝি হাদীছ সংকলন ও ফিক্বহী মাসাআলা সংকলনের সূচনা হয়। আর ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ভঙ্গুর হওয়া পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ মূলতঃ শুরু হয় ৩য় শতকের প্রারম্ভে। বিভিন্ন শহর-নগর থেকে হাদীছ সংগ্রহের দীর্ঘ অভিযাত্রা এবং আয়াসসাধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার বিশুদ্ধতা যাচাই– ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ইসলামী শরী'আহ লিখিত আকারে সুরক্ষা লাভ করে। ফলে ফক্বীহদের জন্য সরাসরি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মূল উৎসের মাধ্যমে ফৎওয়া প্রদান করা সহজসাধ্য হয়। আর রাসূল (ছাঃ) বিবৃত হাদীছ এবং ছাহাবা ও তাবেঈনদের অনুসৃত নীতি মোতাবেক পরিচালিত ইসলামের সহজ-সরল বিশুদ্ধতম পথ খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে আবারও সুস্পষ্ট হ'তে শুরু করে। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং ছাহাবা, তাবেঈদের ফিক্বহ সম্পর্কে বুঝগত তারতম্যের কারণে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে উছূলগত কিছু বিষয়ে ও আহকাম সাব্যস্তকরণে বেশ কিছু মতভেদ ঘটে। তাঁদের নিজ নিজ মতের স্বপক্ষে অনুসারীদল গড়ে উঠল। আর শাসকগণও মাসআলাগত এসব বিতর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেন এবং বিতর্ক অনুষ্ঠানে নিজেরা উপস্থিত থাকতেন। ফলে এসব বিতর্ক স্থায়ীরূপ লাভ করে এবং পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র ফিক্বহী মাযহাব সৃষ্টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দেয়।

তবে লক্ষ্যণীয় যে, এ যুগের ওলামায়ে কেরাম কেবল দলীলের ভিত্তিতে বিতর্ক করতেন। তারা কারো অন্ধ অনুসরণ বা তাক্বলীদ করতেন না। কোন মতের উপর আঁকড়ে পড়ে থাকতেন না। বরং দলীলের ভিত্তিতে হক্বের সন্ধান পেলে তা-ই তারা মেনে নিতেন।[১৬] এ যুগে হাদীছ গ্রন্থ, ফিক্বহী মাসায়েল, ছাহাবা-তাবেঈনের ফিক্বহ, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ফিক্বহ প্রভৃতি গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়।

যে সকল প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ এ সময় সংকলন করা হয় সেগুলো হ'ল- ইমাম মালেকের মুওয়াত্ত্বা, আহমাদ বিন হাম্বলের আল-মুসনাদ, ইমাম বুখারীর আল-জামে' আছ ছহীহ, ইমাম মুসলিমের ছহীহ মুসলিম, ইমাম আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহর সুনানসমূহ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত হাদীছ সংকলনগ্রন্থ। এছাড়া ফিক্বহী মাসায়েলের যে সকল গ্রন্থ খ্যাতি লাভ করেছিল, তার মধ্যে সুফিয়ান ছাওরীর 'আল- জামে' আল-কাবীর', ইমাম শাফেঈর 'ইখতিলাফুল হাদীছ', 'কিতাবুল উম্ম', আবু ইউসুফের 'কিতাবুল খারাজ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(চলবে)

১৬. ঐ, ৯২-৯৩ পৃঃ।

৯৫. আত-তাশরীঈ ওয়াল ফিক্বহ ফিল ইসলাম, পৃঃ ২৯১।
৯৬. ড. উমর সুলায়মান আল-আশকার, তারীখুল ফিক্বহ আল-ইসলামী (আম্মান : দারুন নাফায়েস, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯০ খৃঃ), পৃঃ ৮৭।
৯৭. আত-তাশরীঈ ওয়াল ফিক্বহ ফিল ইসলাম, ২৯৪ পৃঃ।
৯৮. তারীখুল ফিক্বহ আল-ইসলামী, ৮৬ পৃঃ।

ওয়াহ্হাবী আন্দোলন : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব

*-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

মধ্য আরবের প্রাচীন উচ্চভূমি অঞ্চল 'নাজদ'। অষ্টাদশ শতকে এ ভূখণ্ডে ঘটে যায় এক অসাধারণ ইসলামী বিপ্লব। ইসলাম আগমনের পূর্বে অজ্ঞতার তিমির প্রহেলিকা আরবজাতিকে যেমন আচ্ছাদিত করে রেখেছিল, ঠিক তেমনি আব্বাসীয় শাসনামলের পতনের পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি পুনরায় খোদ 'অহি-র অবতরণস্থল' আরবের বুকে ধীরে ধীরে জমাট বেঁধেছিল জাহেলিয়াতের গাঢ় তমিস্রা। শিরক-বিদ'আতের ভয়াবহ আগ্রাসনে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিল ইসলামের ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির আদিকাঠামো। এমনই এক ক্রান্তি লগ্নে বলা যায় ইসলামের পুনর্জন্মবার্তা নিয়েই 'ওয়াহ্হাবী আন্দোলন' তথা ইসলামের বিশুদ্ধ রূপের দিকে প্রত্যাবর্তনবাদী ও সংস্কার-অনুবর্তী এই আন্দোলনের জন্ম হয়। বৈশিষ্ট্যগত কারণে এ আন্দোলনকে সালাফী আন্দোলন বা মুওয়াহ্হিদীন আন্দোলন বলে আখ্যা দেয়া হয়। এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন সালমান বিন আলী আত-তায়মী (১৭০৩-১৭৬১ খৃঃ) রাহিমাহুল্লাহ। অহী নাযিলের পবিত্র ভূমি আরবের বুকে এই মহান যুগসংস্কারক কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনই ঘটাননি; বরং নাজদ থেকে এমন এক ইসলামী সমাজের উত্থান ঘটান যা খুলাফায়ে রাশেদীনের পর অহি-র প্রাণকেন্দ্রে পুনরায় তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর ভিত্তিশীল একটি বৃহত্তর আরব রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়েছিল। যার বিকীর্ণ আলোকচ্ছটা আরব মরুর দিকচক্রবাল পেরিয়ে পরবর্তীতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

এ আন্দোলন ছিল মুসলিম বিশ্বে শিরক, বিদ'আত অর্থাৎ ইসলামী শরী'আতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নবসৃষ্ট বিধি-বিধান, বিজাতীয় সংস্পর্শ থেকে আগত যাবতীয় শিরকী ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম একটি সংগঠিত ও সফল আন্দোলন, যা মধ্যযুগীয় অবক্ষয়কালীন দুর্যোগ কাটিয়ে ইসলামের নবতর বিকাশের জন্য এক যুগান্তকারী মাইলফলকে পরিণত হয়। আধুনিক যুগের সকল ইসলামী সংস্কারবাদী আন্দোলনের আদর্শিক প্রেরণা এই আন্দোলন। সৈয়দ আব্দুল কুদ্দূস যথার্থই বলেন, 'আধুনিক যুগে ইসলামী রেঁনেসার উৎপত্তি মূলতঃ অষ্টাদশ শতকের 'ওয়াহ্হাবী' আন্দোলন থেকে। দার্শনিক ও আদর্শগত দিক থেকে এই রেঁনেসার ইতিহাস মূলতঃ ওয়াহ্হাবী আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা'।[৯৯] মহাকবি ইকবাল এই আন্দোলনকে আখ্যা দিয়েছেন- "The first throb of life in modern Islam" অর্থাৎ 'আধুনিক ইসলামের প্রথম হৃদস্পন্দন' হিসাবে।[১০০] আল্লামা যিরিকলী বলেন, 'এই দাওয়াত ছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আধুনিক নবজাগরণে সর্বপ্রথম বিচ্ছুরিত আলোকধারা। যার প্রভাবে ভারত, মিসর, ইরাক ও সিরিয়ার সংস্কারবাদীগণ উদ্বুদ্ধ হন'।[১০১] মুহাম্মাদ যিয়াউদ্দীন আর-রীস বলেন, 'এ আন্দোলন এমন দু'টি মূলনীতিকে ধারণ করেছিল, মুসলিম বিশ্বের অগ্রযাত্রায় যার প্রভাব সর্বাধিক। **এক.** পবিত্র কুরআন ও হাদীছ- এই দু'টি মূলসূত্রের উপর নির্ভরতা এবং সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত নীতিমালার দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান ও **দুই.** ইজতিহাদের নীতি প্রবর্তন। এই দু'টি নীতি হ'ল মুসলিম সমাজে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক জাগরণের ভিত্তি। বলা বাহুল্য, এই দু'টি নীতি অবধারণের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হওয়া প্রাচ্যের সকল সংস্কারবাদী আন্দোলনই ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের কাছে সর্বৈব ঋণী। এ আন্দোলনের সাথে অন্যান্য সব আন্দোলন দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত, হয় সরাসরি গ্রহণের মাধ্যমে অথবা অনুসরণের মাধ্যমে, নতুবা অন্ততঃ প্রভাবিত হওয়ার মাধ্যমে।[১০২]

মুসলিম সমাজে এ আন্দোলনের প্রভাব কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে মরক্কোর স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা প্রখ্যাত শল্যবিদ ও দার্শনিক আব্দুল করীম আল-খাত্বীব (১৯২১-২০০৮ খৃঃ) বলেন, والذي لا شك فيه، أن الدعوة الوهابية كانت أشبه بالقذيفة الصارخة، تنفجر في جوف الليل والناس نيام- كانت صوتا قويا رائدا أيقظ المجتمع الإسلامي كله، وأزعج طائر النوم المحوم علي أوطانهم منذ أمد بعيد- 'নিঃসন্দেহে ওয়াহ্হাবী আন্দোলন ছিল এক প্রচণ্ড নিনাদসম্পন্ন মিসাইলের মত; যা বিস্ফোরিত হয়েছিল এক গভীর রাতের অমানিশার মাঝে, যখন মানুষ ছিল নিদ্রামগ্ন। এর আওয়াজ ছিল এমনই তীব্র ও সুদূরপ্রসারী যে তা সমগ্র মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং তা যেন সুদীর্ঘকাল পর নিদ্রাচ্ছন্ন বুভুক্ষ পাখীকে আপন

* এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৯৯. Syed Abdul Quddus, The Challenge of Islamic Renaissance, (Dehli : Adam Publishers, 1990), P. 17.
১০০. প্রাগুক্ত, ১৭ পৃঃ।
১০১. খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম (বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ১৫তম প্রকাশ : ২০০২ খৃঃ), ৬/২৫৭ পৃঃ।
১০২. আহমাদ বিন হাজার আলে বুত্বামী, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, আক্বীদাতুহুস সালাফিয়্যাহ ওয়া দা'ওয়াতুহুল ইছলাহিয়্যাহ ওয়া ছানাউল উলামা আলাইহে (কুয়েত : আদ-দারুস সালাফিয়্যাহ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৩ খৃঃ), পৃঃ ১৩৫।

বাসস্থানে চঞ্চল করে তুলেছিল'।[১০৩] ড. আমীনুল ইসলাম বলেন, এ আন্দোলন আরবদের শুধু আত্মসমালোচনা ও আত্মানুসন্ধানের জন্যই সজাগ করে দেয়নি, একই সঙ্গে তাদের জাগিয়ে দিয়েছে সেই মোহনিদ্রা থেকে, যা কিনা নিহিত ছিল তাদের অবক্ষয়ের মূলে। এ আন্দোলন তাদের মনে যে শক্তি ও গতি সঞ্চার করে, সেটিই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল একাধিক সংস্কারধর্মী কর্মসূচি গ্রহণে।'[১০৪] ইয়াহইয়া আরমাযানী বলেন, 'উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার দিক থেকে এ আন্দোলন ৭ম শতাব্দীতে পরিচালিত নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আন্দোলনের সাথে এমনই সাদৃশ্যপূর্ণ যে, কেউ কেউ একে ইসলামের দ্বিতীয় আবির্ভাব বলে বিবেচনা করে থাকেন।[১০৫] এ আন্দোলনের যুগান্তকারী প্রভাবকে খৃষ্টসমাজের প্রটেস্ট্যান্টদের[১০৬] উত্থানের সাথে তুলনা করে T.P.Huges বলেন, 'ওয়াহ্হাবীজমকে কখনও কখনও ইসলামের প্রটেস্ট্যানিজম বলা হয়; আর বাস্তবিকই তাই, যদিও এখানে বড় পার্থক্য হ'ল খৃষ্টান প্রটেস্ট্যান্টরা তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোকে যথাযথ সম্মান করলেও প্রথাগত ধর্মীয় রীতিনীতিকে স্বীকার করে না। আর ওয়াহ্হাবীজম পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীছের শিক্ষাকেও দৃঢ়ভাবে ধারণ করে'।[১০৭]

বিগত দু'শত বছরের ইসলামী ইতিহাসে ওয়াহ্হাবী আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। অথচ ইতিহাসে এ আন্দোলন যেমন একটি ইতিবাচক সংস্কারবাদী আন্দোলন হিসাবে নন্দিত হয়েছে, তেমনি শুরু থেকে অদ্যাবধি এ আন্দোলন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে একটি বড় অংশের তীব্র বিরোধিতা ও শত্রুতার শিকার হয়েছে। একদিকে একদল নামধারী মাযহাবী, পীরপন্থী আলেম-ওলামা এ আন্দোলনকে ইসলাম বহির্ভূত প্রমাণ করার জন্য প্রাণান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে; অন্যদিকে পশ্চিমারা ও তাদের খুদ-কুড়ো খাওয়া এক শ্রেণীর মুসলমান তাদের 'মুক্তবুদ্ধি' দর্শনের জন্য বিপজ্জনক চিহ্নিত করে। এ আন্দোলনকে পশ্চাদমুখী, চরমপন্থী, মৌলবাদী, জঙ্গীবাদী ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে মুসলিম বিশ্বকে এর প্রভাবমুক্ত রাখার অপপ্রয়াস চালিয়ে আসছে। অধুনা পশ্চিমা বিশ্বের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র প্রধান টার্গেট হ'ল এই আন্দোলনের ভাবানুকূল বিশ্বের বিভিন্ন আদর্শিক আন্দোলনসমূহ। যাকে তারা 'ওয়াহ্হাবীজম' ও 'সালাফীজম' বলে আখ্যায়িত করে। এসকল প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আলোচ্য নিবন্ধে এ আন্দোলনের পরিচিতি ও মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, একে মানুষের চোখে হীনকরভাবে দেখানোর জন্য বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে এ আন্দোলনকে 'ওয়াহ্হাবী'[১০৮] আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা পরে ইউরোপীয়দের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পায় (একই উদ্দেশ্যে এ নামটি পাক-ভারত উপমহাদেশের 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া' আন্দোলনের সাথেও জুড়ে দেয়া হয়েছিল)। এতদসত্ত্বেও সমধিক প্রসিদ্ধির কারণে বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে প্রচলিত এই নামটিই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের পরিচয় :

নামকরণ :

আগেই বলা হয়েছে, 'ওয়াহ্হাবী আন্দোলন' নামকরণটি এ আন্দোলনের উদ্গাতা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বা তাঁর অনুগামীদের প্রবর্তিত নয়। পরবর্তী ঐতিহাসিকরা ভুলক্রমে হোক কিংবা বিদ্বেষবশতঃ হোক এ আন্দোলনকে এই নামে পরিচিত করে তুলেছেন। এটা মূলতঃ এ আন্দোলনের বিরোধীদের পক্ষ থেকে গালি স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। হাসান বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়খ এ সম্পর্কে বলেন, 'ওয়াহ্হাবিয়্যাহ বিশেষণটি এ আন্দোলনের অনুগামীরা সৃষ্টি করেনি। বরং তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদেরকে পৃথক করার জন্য এটা ব্যবহার করে যেন মানুষ তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে এবং শ্রোতারা মনে করে যে, এ আন্দোলন প্রচলিত বড় বড় চারটি মাযহাবের বিপরীতে পঞ্চম একটি মাযহাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তবে এ আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদেরকে 'সালাফী' এবং তাদের দাওয়াতকে 'সালাফী দাওয়াত' বলে আখ্যায়িত করাকেই অধিক পসন্দ করতেন।"[১০৯] এই ঐতিহাসিক 'ভুল' অথবা 'ষড়যন্ত্রমূলক' অভিধাটি সারাবিশ্বে আজও পাকাপোক্তভাবে বিদ্যমান। ফলে দেখা যায়, বর্তমান

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৫।
১০৪. ড. আমীনুল ইসলাম, ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম দর্শন (ঢাকা : উত্তরণ, ১ম প্রকাশ, ২০০৪ ইং) পৃঃ ২৩০।
১০৫. ইয়াহইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, মূল : Middle East past and present, মুহাম্মাদ ইনাম-আল-হক অনূদিত (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০), পৃঃ ২৬০।
১০৬. প্রটেস্টানিজম হ'ল ষোড়শ শতকে ইউরোপীয় খৃষ্টসমাজে পরিচালিত একটি বিখ্যাত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, যা খ্যাতনামা সংস্কারক মার্টিন লুথার কিং তৎকালীন ক্যাথলিক চার্চের পোপদের দুর্নীতি ও তাদের প্রবর্তিত ভ্রান্ত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে শুরু করেছিলেন। ১৫১৭ সালে শুরু হয়ে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত সারা ইউরোপ জুড়ে ছিল এ আন্দোলনের ব্যাপ্তি, যাতে এক বিরাট ধর্মীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।
১০৭. Thomas Patric Huges, Dictionary of Islam (Delhi : Rupa & Co. 1988), P. 661.
১০৮. এটি একটি অপপ্রয়োগ (misnomer)। কেননা আন্দোলনের উদ্গাতা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের নামেই যদি এই নামকরণ করা হয়ে থাকে, সে হিসাবে বড় জোর একে 'মুহাম্মাদী আন্দোলন' বলা যেত। কিন্তু অযৌক্তিকভাবে তাঁর পিতার নামানুসারে 'ওয়াহ্হাবী আন্দোলন' নামকরণ করা হয়েছে। মাসউদ আলম নাদভীর মতে, প্রথম এ ভুলটি করেন John Lewis Burkhardt (১৭৮৪-১৮১৭ খৃঃ) নামক এক ইউরোপীয় পর্যটক। এরপর তা বিভিন্ন লেখকদের মাধ্যমে জনসমাজে প্রচার পায় (দ্রঃ মাসউদ আলম নাদভী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব : মুছলিহুন মাযলূমূন ও মুফতারা আলাইহ, উর্দূ থেকে আরবী অনুবাদ: আব্দুল আলীম আল-বাসতুভী (রিয়াদ : ১৪২০ হিঃ) পৃঃ ১৯৪; এ.জেড.এম শামসুল আলম, প্রবন্ধ : 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ও ওয়াহ্হাবী মতবাদ', ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা : ৪৪ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৫, পৃঃ ২১০।
১০৯. হাসান বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়েখ, প্রবন্ধ : আল-ওয়াহ্হাবিয়াহ ওয়া যাঈমুহা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, গৃহীত : ফরীদ ওয়াজদী, দায়েরাতু মা'আরিফিল ক্বারনিল ইশরীন (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ৩য় প্রকাশ), পৃঃ ৮/৮২১।

বিশ্বের যে দেশেই ইসলামী সংস্কারবাদী আন্দোলন তথা নিখাদ তাওহীদের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বানকারী আন্দোলন পরিদৃষ্ট হয়, সেখানেই বিরুদ্ধবাদীরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও বিচ্ছিন্ন দল হিসাবে দেখানোর জন্য 'ওয়াহ্হাবী' ট্যাগ লাগিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালায়।

বর্তমান ওবামা প্রশাসনের কাউন্টার টেরোরিজম উপদেষ্টা Quintan Wiktorowicz তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা পেপার *Anatomy of the Salafi Movement*-এ লিখেছেন, 'সালাফী মতবাদের বিরোধীরা প্রায়ই এ মতবাদকে বহিরাগত প্রভাবজাত মতবাদ হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য 'ওয়াহ্হাবী' বলে সম্বোধন করে। তাদের উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরকে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের অনুসারী' হিসাবে পরিগণিত করা। সাধারণতঃ যেসব দেশে সালাফীগণ সংখ্যায় স্বল্প এবং স্থানীয় অধিবাসীরা ধীরে ধীরে তাদের মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, সেসব দেশে তাদেরকে 'ওয়াহ্হাবী' বলে আখ্যায়িত করা হয়।[১১০] অনুরূপভাবে A. J. Arberry, George Rentz প্রমুখ প্রাচ্যবিদের গবেষণায় এবং স্বীকৃত কয়েকটি বিশ্বকোষে এই ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করা হয়েছে।[১১১] প্রকৃতপক্ষে এ আন্দোলনের বিশেষ কোন নাম ছিল না। তবে সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত পথের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের আহ্বানকারী হিসাবে এটি পরবর্তীতে 'সালাফী আন্দোলন' নামে খ্যাতি লাভ করেছে।

পরিচয় :

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রভূমি নাজদ অঞ্চলে জন্ম নিয়েছিলেন ক্ষণজন্মা যুগসংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)। আরবের বুকে দীর্ঘকালব্যাপী জেঁকে বসা শিরক ও বিদ'আতের বিপুল আস্ফালনকে রুখে দিয়ে অমাবস্যা রাতে ধূমকেতুর মতই চমক জাগিয়ে তিনি যে দুঃসাহসী আন্দোলন শুরু করেছিলেন; তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল আরবের বুকে আল্লাহ্র কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং সালাফে ছালেহীনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের ভিত্তিতে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া নির্ভেজাল ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটান এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাদান। স্মর্তব্য যে, এটি আকস্মিক আবির্ভূত কোন আন্দোলন ছিল না; বরং ইসলামের ইতিহাসে অনুরূপ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত অনেক। ইরাকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (৭৮০-৮৫৫ খৃঃ), সিরিয়াতে ইমাম আহমাদ ইবনে তায়মিয়া (১২৬৩-১৩২৮ খৃঃ), মিসরে ইয্ বিন আব্দুস সালাম (১১৮১-১২৬১ খৃঃ), মরক্কো ও স্পেনে ইমাম শাত্বেবী (১৩৮৮ খৃঃ), ইয়ামনে ইমাম ছান'আনী (১৬৮৮-১৭৬৮ খৃঃ) প্রমুখ মহান যুগসংস্কারকবৃন্দ প্রত্যেকেই হক্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরূপ আন্দোলন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং খারেজী, মু'তাযিলীসহ পথভ্রষ্ট আক্বীদাসমূহের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

মুসলিম বিশ্বে যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তারের কারণে এ আন্দোলন বিশ্ববাসীর নযরে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। মুসলিম-অমুসলিম, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে জ্ঞানী মহল এ আন্দোলনের উপর বিশেষ গবেষণা চালিয়েছেন। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হ'ল, সংস্কারধর্মী ও বিশুদ্ধবাদী বৈশিষ্ট্যের কারণে এ আন্দোলনের উপর পাশ্চাত্যের সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে নেতিবাচক বা ইতিবাচক যত গবেষণা হয়েছে, সম্ভবতঃ মুসলিম বিশ্বের ইসলামী কেন্দ্রগুলোতেও তত হয়নি। নিম্নে এ আন্দোলনের পরিচয় সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের বক্তব্য তুলে ধরা হ'ল-

১- মিসরীয় পণ্ডিত ড. ত্বহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খৃঃ) বলেন, 'এই নতুন মাযহাবটি বাহ্যত নতুন মনে হ'লেও মর্মগতভাবে এটি সনাতনই। অর্থাৎ সমকালীন পেক্ষাপটে নবীন হ'লেও মৌলিকত্বের দিক থেকে এটি প্রাচীন। কেননা এ দাওয়াত ছিল বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র এবং শিরক ও পৌত্তলিকতামুক্ত আদি ইসলামের দিকে ফিরে যাওয়ার এক শক্তিশালী দাওয়াত। ... এটি ছিল স্বয়ং ইসলামের দিকেই দাওয়াত, যে দাওয়াত নিয়ে নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে শীর উঁচু করে থাকা যাবতীয় তথাকথিত মাধ্যমসমূহ উচ্ছেদের লক্ষ্যে। এ দাওয়াত পরিচালিত হয়েছিল আরবীয় ইসলামকে পুনরুজ্জীবন দান এবং অজ্ঞতা-মূর্খতা ও অনারব সংস্পর্শের প্রভাবজাত সৃষ্ট যাবতীয় ময়লা-আবর্জনাকে পরিশোধনের জন্য'।[১১২]

২- লেবাননী লেখক আমীর শাকীব আরসালান (১৮৬৯-১৯৪৬ খৃঃ) বলেন, 'এই আন্দোলন ছিল সঠিক আক্বীদা, সালাফে ছালেহীনের নীতিমালা এবং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবাদের পদাংক অনুসরণের দিকে প্রত্যাবর্তনে আহ্বানকারী একটি আন্দোলন। যা কুসংস্কার, বিদ'আত, গায়রুল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা বা আনুগত্য প্রকাশ, কবরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান, আওলিয়ায়ে কেরামের অবস্থানস্থলে ইবাদত করা ইত্যাকার কার্যকলাপকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করে।[১১৩]

১১০. Quintan Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi Movement" in "Studies in Conflict & Terrorism" USA, Vol. 29, Issue. 3 (2006), P. 235.

১১১. Encyclopedia of Islam and the Muslim World, Editor in Chief Richard C. Martin, V-2 (New York : Macmillan Referance, 2004), P. 727.

১১২. ত্বহা হুসাইন, আল-হায়াতুল আরাবিয়্যাহ ফি জাযীরাতিল আরাব (দামেশক : ১ম প্রকাশ, ১৯৩৫ খৃঃ), পৃঃ ১৩। গৃহীত : প্রবন্ধ "হাক্বীকাতুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব", ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সালমান, মাজাল্লাতুল বুহূছ আল-ইসলামিয়াহ (রিয়াদ : ১৪০৮ হিঃ, ২১ তম সংখ্যা), পৃঃ ১২৭।

১১৩. হাযেরুল 'আলামিল ইসলামী, আরবী অনুবাদ : উজাজ নুয়াইহিয, সম্পাদনা : আমীর শাকীব আরসালান, মূল ইংরেজী : Lothrob Stoddard, The New World of Islam (P.1921) (বৈরূত : দারুল ফিকর, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৩ইং), ১/২৬৪ পৃঃ।

৩- আমেরিকান পণ্ডিত লোথ্রোব স্টোডার্ড (১৮৮৩-১৯৫০ খৃঃ) চমৎকারভাবে এর পরিচয় দিয়েছেন, 'ওয়াহ্হাবী দাওয়াত একটি বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ সংস্কারবাদী দাওয়াত। যার উদ্দেশ্য ছিল অলৌকিকতার ধারণাকে পরিশুদ্ধ করা, যাবতীয় অস্পষ্টতা, সন্দেহ ও কুসংস্কারের অবসান ঘটান। মধ্যযুগে ইসলামের মধ্যে তথাকথিত মুসলিম পণ্ডিতরা যেসব বৈপরিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও পরস্পর বিরোধী সংযোজন ঘটিয়েছিলেন তা নাকচ করা এবং যাবতীয় বিদ'আতী কর্মকাণ্ড ও ওলী-আওলিয়ার উপাসনাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা। সর্বোপরি ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং আদি ও মৌলিক উৎসগুলোর মাধ্যমে ইসলামকে ধারণ করার আহ্বানই ছিল ওয়াহ্হাবী দাওয়াতের সারনির্যাস।

৪. ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের উপর প্রথম তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনাদাতা সুইস পর্যটক জন লুইস বারখাডট (John Lewis Burkhardt) তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখেছেন, 'ওয়াহ্হাবীদের ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ নব্য কোন ধর্মবিশ্বাস ছিল না।...তাদের এবং সুন্নী তুর্কীদের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, ওয়াহ্হাবীরা শরী'আতকে কঠোরভাবে অনুসরণ করত, যখন অন্যরা তা অবহেলা করত অথবা পূর্ণাঙ্গভাবে তা অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকত'।[১১৪]

মোটকথা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে সর্বত্র একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, ওয়াহ্হাবী আন্দোলন মূলতঃ এমন একটি সংস্কারপন্থী ও বিশুদ্ধবাদী আন্দোলন, যা শিরককে সর্বতোভাবে বর্জনের মাধ্যমে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতিষ্ঠাদানে সফল সংগ্রাম চালিয়েছিল এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও নামধারী আলেম-ওলামা এবং বিদ্বেষী মহল প্রথম থেকেই হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ আন্দোলনের বিরূদ্ধে কদর্যপূর্ণ অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। তবুও এ আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীকে তারা বিন্দুমাত্র প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেনি। বরং এ আন্দোলন বিগত তিন শতকে ইসলামকে শিরক ও বিদ'আতের অশুভ ছায়া থেকে উদ্ধার এবং আদি ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষাকে পুনরায় বিশ্বের বুকে জাগ্রত করার এক অনন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বের বুকে এ আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছে নির্ভেজাল তাওহীদ তথা অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনাবিল সুবাতাস। বাতিলের কোটি কণ্ঠের সমবেত গর্জন, শত বাধার বিন্ধ্যচল এর অগ্রযাত্রায় যে কোনরূপ বাধা হ'তে পারেনি সেটাই সতত দৃশ্যমান।

ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের উৎপত্তি ও সমসাময়িক মুসলিম বিশ্ব :

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের এই বরকতময় আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটেছিল মূলতঃ ১১৪৩ হিঃ মোতাবেক ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর আন্দোলন সারা আরবে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ক্রমশঃ জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।[১১৫] তিনি তাওহীদের পবিত্র দাওয়াত নিয়ে যখন আরব সমাজে নেমেছিলেন, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তখন মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অতীব নাজুক। সার্বিক অবস্থা ছিল এতই দুর্দশাগ্রস্ত ও কলুষিত যে, বহু ক্ষেত্রে তা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছিল। নিম্নে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি সংক্ষিপ্তাকারে পেশ হ'ল।

রাজনৈতিক অবস্থা :

অষ্টাদশ শতকের শুরুতে মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তুরস্কের ওছমানীয় খেলাফত, পারস্যের ছাফাভী এবং ভারতের মোগল-এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্য।[১১৬]

ওছমানীয় সাম্রাজ্য : প্রতাপশালী ওছমানীয় সাম্রাজ্যের শাসকগণ তখন এতই দুর্বল হয়ে পড়েন যে, তারা মন্ত্রী পরিষদ ও ভঙ্গুর সেনাবাহিনী প্রধানদের হাতের পুতুলে পরিণত হন, যারা রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে মোটেও অভিজ্ঞ ছিলেন না। বিভিন্ন অঞ্চলে যারা গভর্নর হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন তারাও ছিলেন দুর্বলচেতা ও প্রশাসন পরিচালনায় অদক্ষ। জনগণের কাছ থেকে কর আদায় ছাড়া তাদের আর কোন চিন্তা ছিল না। সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ায় ওছমানীয় সাম্রাজ্য প্রায় সর্বদিক থেকে ইউরোপীয়দের কব্জাভূত হয়ে পড়ে এবং একের পর এক অঞ্চল ইউরোপীয়দের ভাগবাটোয়ারার শিকার হ'তে থাকে। অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ওছমানীয় সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত তিউনিসিয়া, আলজেরিয়াতেও বিরাজ করছিল একই অবস্থা। মরক্কোতে চলছিল সা'দ বংশের শাসন। তারাও স্প্যানিশ ও পর্তুগীজদের হামলার ভয়ে সবসময় তটস্থ থাকত। আর আরব ও বার্বারসহ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ তো লেগেই ছিল।

ছাফাভী সাম্রাজ্য : প্রায় আড়াইশ বছর রাজত্ব করার পর পারস্য তথা ইরানের ছাফাভী সাম্রাজ্য তখন আফগানদের দখলে চলে যায়। ১৭২৯ সালে ক্ষমতায় আরোহন করেন আফগান শাসক নাদির শাহ। তিনি নিজেকে সাম্রাজ্যের রাজা হিসাবে ঘোষণা করে রাজত্বের সীমানা বাড়াতে

১১৪. John Lewis Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, (London : 282 Henry Colburn and Richard Bentley, 1830), P.275. গৃহীত : 'আশ-শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব হায়াতুহু ওয়া দা'ওয়াতাহু ফির রু'য়াতিল ইসতিশরাক্বিয়া, নাছের বিন ইবরাহীম আত-তাওভীম (রিয়াদ : ১ম প্রকাশ, ২০০২ খৃঃ), পৃঃ ২৬।

১১৫. শায়খ সালমান বিন সাহমান, আয-যিয়া আশ-শারেক ফি রাদ্দি শুবহাতিল মায়েক আল-মারেক (রিয়াদ : ইদারাতুল বুহূছ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৪ খৃঃ), পৃঃ ১০।

১১৬. ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সালমান, প্রবন্ধ : হাক্বীক্বাতু দাওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ওয়া আছরুহা ফিল 'আলামিল ইসলামী, মাজাল্লাতুল বুহূছ আল-ইসলামিয়াহ, পৃঃ ১২৮।

থাকেন এবং আরব সাগর থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বের সীমানা বিস্তৃত করেন। ১৭৪৭ তাঁর মৃত্যু হ'লে সাম্রাজ্য জুড়ে শুরু হয় বিশৃংখলা। ১৭৮৮ সালে কাজার বংশ ক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত এই অরাজক অবস্থা চলতে থাকে।

মোগল সাম্রাজ্য : মোগল সাম্রাজ্যের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। আমীর-ওমারাদের গৃহযুদ্ধে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হ'তে থাকে। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পরই মূলতঃ বৃটিশদের হাতে এর চূড়ান্ত পতন ঘটেছিল।

ধর্মীয় অবস্থা :

মুসলমানদের ধর্মীয় অধঃপতনের সূচনা অবশ্য আরো কয়েকশত বছর পূর্বেই হয়েছিল, যখন মুসলিম সমাজে যিন্দীক তথা অন্তরে কুফরী গোপন রেখে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণকারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। ইসলামী খিলাফতের স্বর্ণযুগে এসব ভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যক্তিদের গোপন ষড়যন্ত্র এবং তাদের আমদানী করা বিষাক্ত চিন্তা-দর্শন ইসলামী আক্বীদা-আমলের উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মুসলিম সমাজ নানা ফেরকা ও মাযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তার পর থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে এই অধঃপতনের ধারা অব্যাহত থাকে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওছমানীয় সাম্রাজ্যের পতন যখন আসন্ন হয়ে উঠে, তখন পরিস্থিতি হয়ে পড়ে আরো নাজুক। বিশেষতঃ আলেম-ওলামার মন-মগজে চেপে বসে এক ধরনের জমাটবদ্ধতা, কূপমণ্ডুকতা আর এক অন্ধ ঐতিহ্যপ্রিয়তা। আযহারী হোক বা হেজাযী হোক অধিকাংশ ওলামা এই দুর্দশায় নিপতিত ছিলেন।

ধর্মীয় এই অধঃপতনের পিছনে শাসকসমাজের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তারা কোনরূপ সংস্কারধর্মী ও সংশোধনমূলক চিন্তাকে স্বাগত জানাতেন না; বরং এরূপ চিন্তাধারার লোকদের তারা প্রায়শই কাফের বলে সাব্যস্ত করতেন। যেমনভাবে তারা ওয়াহ্হাবী আন্দোলনকেও ইসলাম বহির্ভূত সাব্যস্ত করেছিলেন। অথচ অপরদিকে তারা বিদ'আতী ও ছূফীদের বিশেষভাবে প্রশ্রয়দান করেন, যাতে ছূফীদের প্রতি অনুরক্ত জনগণের কাছে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে ছূফীবাদীরা একই সাথে শাসক ও জনগণের প্রশ্রয় পেয়ে তাদের বিদ'আতী আক্বীদা ও আমল প্রচারের উর্বর ক্ষেত্র পেয়ে যায়। এমনকি তাদের কেউ কেউ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার দায়িত্বও পেয়ে যায়। এভাবে তাদের দৌরাত্ম্যে ওছমানীয় খেলাফতের সর্বত্র শিরক ও বিদ'আতের বাধাহীন প্রসার ঘটে। ফলশ্রুতিতে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো থেকে তাওহীদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক আক্বীদা-আমল বিলীন হ'তে থাকে। বিভিন্ন দেশে একের পর এক গড়ে উঠতে থাকে ওলী-আওলিয়াদের সুরম্য মাযার। এসব কবর-মাযারের প্রাচুর্য মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে সরিয়ে নিয়ে ওলী-আওলিয়ামুখী করে তুলে। আল্লাহ্র পরিবর্তে মাযারের ওলীর উপরই তারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সেখানে গিয়ে দো'আ-দরূদ, নযর-নেওয়ায, কুরবানী ইত্যাদি পেশ করতে থাকে। আর নানা অলীক ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কারের তো কোন ইয়ত্তা ছিল না। ফলে কবর-মাযার সংস্কৃতির প্রভাব হেজায ও ইয়েমেন থেকে শুরু করে সিরিয়া, ইরাক, মিসর, পশ্চিম আফ্রিকা ও পূর্বপ্রাচ্য পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের সর্বত্রই বাধাহীনভাবে ছড়িয়ে পড়ে।[১১৭] মানুষ শিরক ও বিদ'আতকেই ইসলাম ভেবে একনিষ্ঠতার সাথে পালন করতে থাকে। ফলে তাদের জীবনাচরণে তাওহীদ ও সুন্নাতের খুব সামান্য নিদর্শনই অবশিষ্ট ছিল।[১১৮]

লোথ্রোব স্টোডার্ড সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়কে এভাবে চিত্রিত করেছেন, 'দ্বীনে ইসলাম তখন হারিয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণ আবরণীর অন্তরালে। ইসলামের বার্তাবাহক রাসূল (ছাঃ) দুনিয়ার বুকে যে একত্বের নীতি বাস্তবায়ন করেছিলেন, তা আবৃত হয়ে পড়েছিল ছূফীবাদের খোলসে ও কুসংস্কারে বিস্তৃত চাদরে। মসজিদগুলো হয়ে পড়েছিল মুছল্লীশূন্য। সমাজে মূর্খ দ্বীন প্রচারক ও ফকীর-দরবেশের দল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যারা গলায় তাবীয-কবজ-তসবীহ ঝুলিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াত। তারা মানুষের মধ্যে মিথ্যা- অলীক, রহস্যময় সব কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়ে তথাকথিত ওলী-আওলিয়াদের কবরে তীর্থযাত্রার জন্য প্ররোচিত করত এবং কবরে দাফনকৃত মানুষগুলোর শাফা'আত বা সুফারিশ লাভের মিথ্যা প্রলোভন দেখাত।...খোদ মক্কা ও মদীনার অবস্থাও ছিল মুসলিম বিশ্বের আর সব এলাকার মতই। যে পবিত্র হজ্জকে আল্লাহ সামর্থ্যবানদের উপর অপরিহার্য করেছিলেন, তা নিছক এক ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। মোটকথা মুসলমানরা আত্মপরিচয় হারিয়ে যেন পরিণত হয়েছিল অমুসলিমে। পতিত হয়েছিল অধঃপতনের অতল তলে। যদি ইসলামের বার্তাবাহক এই যুগে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতেন এবং ইসলামের এই দুরবস্থা দেখতেন, তবে অবশ্যই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়তেন এবং এসবের জন্য যারা দায়ী, তাদেরকে মুরতাদ ও মূর্তিপূজকদের মতই লা'নত করতেন।[১১৯]

ড. মুহাম্মাদ আশ-শুওয়াঈর বলেন, এ আন্দোলন ছিল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ এবং এ দুইয়ের বিপরীত যাবতীয় কিছু প্রত্যাখ্যানের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন আন্দোলন।[১২০]

[চলবে]

---

১১৭. হুসাইন বিন গান্নাম, রাওযাতুল আফকার ওয়াল আফহাম (বাবাত্বীন : ১ম প্রকাশ, ১৩৬৮ হিঃ), ১/১০ পৃঃ।
১১৮. হাকীকাতু দা'ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ওয়া আছরুহা ফিল 'আলামিল ইসলামী, পৃঃ ১২৯।
১১৯. হাযেরুল 'আলামিল ইসলামী, ১/২৫৯ পৃঃ।
১২০. ড. মুহাম্মাদ আশ-শুওয়াঈর, তাছহীহু খাতাইন তারিখিইন হাওলাল ওয়াহ্হাবিয়া, পৃঃ ৬।

লাইলাতুল মি'রাজ : করণীয় ও বর্জনীয়

*শেখ আব্দুছ ছামাদ**

হিজরী বর্ষের ৪টি মাস হারাম তথা মহা সম্মানিত এবং নিরাপত্তার মাস *(তওবা ৩৬)*। আদিকাল হ'তে এ মাস সমূহের সম্মান ও গুরুত্ব চলে আসছে। এ মাস সমূহে আরবের কাফেররা পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ, ছিনতাই-লুটতরাজ, হত্যা-গুম ইত্যাদি বন্ধ রাখত। উক্ত মাস সমূহের অন্যতম মাস রজব। এ মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা 'মি'রাজ' সংঘটিত হয়েছিল। মি'রাজ ইসলামের ইতিহাসে এমনকি পুরা নবুওয়াতের ইতিহাসেও এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কারণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছাড়া অন্য কোন নবী এই সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। আর এ কারণেই মুহাম্মাদ (ছাঃ) শ্রেষ্ঠ নবী। এ মি'রাজ রজনীতেই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ইবাদত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে লাইলাতুল মি'রাজের গুরুত্ব এবং এ রাতের করণীয় ও বর্জনীয় আলোচনা করা হ'ল-

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَىٰ بِعَبْدِه لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'পরম পবিত্র মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত। যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(ইসরা ১)*।

مِعْرَاجٌ আরবী শব্দ, অর্থ সিঁড়ি। শারঈ অর্থে বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে যে অলৌকিক সিঁড়ির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সপ্ত আসমানের উপরে আরশের নিকটে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সিঁড়িকে 'মি'রাজ' বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে হিজরতের পূর্বে একটি বিশেষ রাতের শেষ প্রহরে বায়তুল্লাহ হ'তে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত 'বোরাক্বে'[১২১] ভ্রমণ, অতঃপর সেখান থেকে অলৌকিক সিঁড়ির মাধ্যমে সপ্ত আসমান পেরিয়ে আরশে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন ও পুনরায় বায়তুল মুক্বাদ্দাস হয়ে বোরাক্বে আরোহন করে প্রভাতের আগেই মক্কায় নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে 'মি'রাজ' বলা হয়।[১২২]

اَسْرَاءٌ ক্রিয়াটি اَسْرَى মূলধাতু হ'তে উৎপন্ন। অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। আয়াতে উল্লিখিত 'ইসরা' বা রাত্রিকালীন ভ্রমণ বলতে মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত সফরকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ 'ইসরা' হ'ল যমীন থেকে যমীনে ভ্রমণ। অনেকটা বিমান বন্দরের 'রানওয়ে'র মত। প্রথমে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দ্রুত ছুটে চলা, অতঃপর ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে ওঠা। আর যমীন হ'তে ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণকে মি'রাজ বলা হয়। কুরআন মাজীদের সূরা বানী ইসরাঈলের ১ম আয়াতে 'ইসরা' এবং সূরা নাজমের ১৩ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত 'মিরাজে'র ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ২৬-এর অধিক ছাহাবী কর্তৃক বুখারী, মুসলিমসহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে মুতাওয়াতির পর্যায়ে মি'রাজের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মি'রাজ অকাট্যভাবে প্রমাণিত একটি সত্য ঘটনা। যাতে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ নেই।

মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা :

একদা রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বার হাতীমে, অন্য বর্ণনায় নিজ গৃহে (উম্মে হানীর) ঘুমিয়ে ছিলেন। রাতের শেষভাগে জিবরীল (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশমতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বোরাকের পিঠে আরোহন করিয়ে বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে তিনি বোরাক্বটিকে একটি পাথরের সাথে বেঁধে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তাঁর নিকট ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণের বিশেষ বাহন উপস্থিত করা হয়। মতান্তরে ঐ বোরাক্বের মাধ্যমে জিবরীল (আঃ) তাঁকে মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য 'সিদরাতুল মুনতাহা'[১২৩] পর্যন্ত নিয়ে যান। পথিমধ্যে প্রথম আসমানে আদম (আঃ), দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ), তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আঃ), চতুর্থ আসমানে ইদ্‌রীস (আঃ), পঞ্চম আসমানে হারূণ (আঃ), ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আঃ) এবং সপ্ত আসমানে মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। অতঃপর জান্নাত-জাহান্নাম ও 'বায়তুল মা'মূর'[১২৪] পরিদর্শন করেন। সিদরাতুল মুনতাহা পৌঁছে জিবরীল (আঃ) তাঁকে তথায় একা রেখে চলে যান। এরপর

---

* *বুলারাটি, আলীপুর, সাতক্ষীরা।*

১২১. *بُرَاقٌ আরবী শব্দ যা بَرْقٌ মূল ধাতু হ'তে নির্গত। এর অর্থ বিদ্যুৎ। এটি বিদ্যুতের মত আশ্চর্যজনক দ্রুতগতিসম্পন্ন ডানাওয়ালা অশ্ব বিশেষ। খচ্চরের চেয়ে ছোট ও গাধার চেয়ে একটু বড়। কর্ণদ্বয় অতি চিকন এবং গায়ের রং ধবধবে সাদা।*

১২২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মি'রাজ, মাসিক আত-তাহরীক, ৭ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃঃ ৩।*

১২৩. *سِدْرَةٌ আরবী শব্দ, অর্থ কুলগাছ। اَلْمُنْتَهَى অর্থ প্রান্তসীমা বা শেষ সীমা। সুতরাং 'সিদরাতুল মুনতাহা' অর্থ প্রান্তস্থিত কুলবৃক্ষ। যা অতীব সুন্দর ও সুসজ্জিত। ফেরেশতাদের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। এর উপরে আল্লাহ্র আরশ অবস্থিত। আল্লাহ্র বিধানাবলী আরশ থেকে প্রথমে এখানে নাযিল করা হয়। অতঃপর সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়। অনুরূপভাবে বান্দাদের আমলনামা সমূহ প্রথমে এখানে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর এখান থেকে আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। ফেরেশতা বা নবী-রাসূল কেউই এই স্থান অতিক্রম করতে পারেননি, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত।*

১২৪. *বায়তুল মা'মূর : সপ্ত আসমানে অবস্থিত ফেরেশতাদের মসজিদ। যাকে আসমানের কা'বা বলা হয়ে থাকে। দৈনিক সত্তর হাযার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য সেখানে প্রবেশ করে এবং বের হয়ে যায়। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেখানে কারো দ্বিতীয়বার প্রবেশের সুযোগ আসবে না।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'রফরফ'[১২৫] বাহন আরশে মু'আল্লাকা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এক টুকরা মেঘ আচ্ছাদিত করে ফেলে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এ সময় মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার অতীব নিকটে আসেন এবং তাঁর দিকে ঝুকে পড়েন। এ সময় উভয়ের মাঝে দূরত্ব ছিল দুই ধনুক বা দুই গজেরও কম। তখন আল্লাহ তাঁকে অহী করেন- ثُمَّ دَنَـــا فَتَدَلَّى- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى- فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى- 'অতঃপর নিকটবর্তী হ'ল এবং ঝুলে গেল। তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল বা তারও কম। তখন আল্লাহ স্বীয় বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা করলেন' *(নাজম ৮-১০)*।

আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ৫০ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর থেকে মেঘমালা সরে গেলে তিনি জিবরীল (আঃ)-এর সাথে দুনিয়াতে ফিরে আসার জন্য রওনা দিলেন। পথিমধ্যে ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আঃ) তাঁকে মি'রাজের প্রাপ্তি ও প্রত্যাদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে ৫০ ওয়াক্ত ছালাতের কথা বলেন। মূসা (আঃ) তাঁকে পুনরায় আল্লাহ্র নিকট ফিরে গিয়ে ছালাতের পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য পরামর্শ দিলেন। মূসা (আঃ)-এর পীড়াপীড়িতে রাসূল (ছাঃ) কয়েকবার আল্লাহ্র নিকট যান এবং ছালাতের ওয়াক্তের পরিমাণ হ্রাস করার অনুরোধ করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে ৫০ ওয়াক্ত ছালাতকে কমাতে কমাতে ৫ ওয়াক্ত করে দেন, যা ৫০ ওয়াক্তের ফযীলতের সমান।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বচক্ষে জান্নাত, জাহান্নাম, বায়তুল মা'মূর, মাকামে মাহমূদ, হাউযে কাওছার ইত্যাদি পরিদর্শন করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আসমানে যে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল তারাও তাঁর সাথে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে সেখানে দু'রাক'আত ছালাতের ইমামতি করেন। (কারো মতে সেটি ছিল ফজরের ছালাত)। ছালাত শেষে তাঁকে জাহান্নামের দারোগা 'মালেক' ফেরেশতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর বোরাক্বে আরোহন করে অন্ধকার থাকা অবস্থায় তিনি পুনরায় মক্কায় নিজ গৃহে ফিরে আসেন।[১২৬]

মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার সময়কাল :

মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার সঠিক তারিখ বা দিনক্ষণ সম্পর্কে মুহাদ্দিছীন ও ওলামায়ে কেরামের মাঝে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর-রাহীকুল মাখতূম-এর লেখক ছফীউর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) এ বিষয়ে ৬টি মতামত উল্লেখ করেছেন। যথা- (১) নবুওয়াত প্রাপ্তির বছর, (২) ৫ম নববী বর্ষে, (৩) ১০ম নববী বর্ষের ২৭শে রজব রাতে, (৪) কেউ বলেছেন, হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে ১২ নববী বর্ষের রামাযান মাসে, (৫) কেউ বলেছেন, হিজরতের ১৪ মাস পূর্বে ১৩ নববী বর্ষের মুহাররম মাসে এবং (৬) কেউ বলেছেন, হিজরতের এক বছর পূর্বে ১৩ নববী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে। অতঃপর মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, প্রথম তিনটি মত গ্রহণযোগ্য নয় এ কারণে যে, খাদীজা (রাঃ) ১০ম নববী বর্ষের রামাযান মাসে মারা গেছেন। আর তখনও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয়নি। আর এ বিষয়ে সকলে একমত যে, ছালাত ফরয হয়েছে মি'রাজের রাত্রিতে। বাকী তিনটি মত সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলোর কোনটিকে আমি অগ্রাধিকার দেব তা ভেবে পাই না। তবে সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, 'ইসরা'র ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের একেবারে শেষের দিকে হয়েছিল।[১২৭]

কারো মতে ৬২০ বা ৬২১ খৃষ্টাব্দে নবুওয়াতের দশম বছরের রজব মাসের ২৭ তারিখ রাতে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) খ্যাতনামা জ্যেষ্ঠ তাবেঈ ইবনু শিহাব যুহরীর বরাতে বলেন, হিজরতের এক বছর পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।[১২৮] অতএব নির্দিষ্টভাবে ২৭শে রজব দিবাগত রাতে মি'রাজ হয়েছিল বলে যে কথা পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত আছে তা নিতান্তই দলীল বিহীন।[১২৯] অন্যান্য ধর্মের লোকের ন্যায় মুসলমানরাও যাতে ধর্মের নামে অহেতুক আনুষ্ঠানিকতায় বন্দী না হয়ে পড়ে সে কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম দিন, লাইলাতুল ক্বদর ইত্যাদির ন্যায় লাইলাতুল মি'রাজের দিন-তারিখকেও ভুলিয়ে দেওয়ার মধ্যে মহান আল্লাহ্র পূর্ণ কৌশল নিহিত আছে বলে অনুমিত হয়।

মি'রাজের প্রাপ্তি :

মি'রাজে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে স্বীয় সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীকে পুরস্কার স্বরূপ তিনটি বিষয় প্রদান করেন। যথা- (১) الصلوات الخمس বা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত। যা ফযীলতের দিক দিয়ে ৫০ ওয়াক্তের সমান। সুতরাং ছালাত হ'ল উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ্র দেওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কার। কারণ ছালাতের মাধ্যমেই মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ঘটে। আর নৈতিক উন্নতিই হ'ল সকল উন্নতির চাবিকাঠি। (২)

---

১২৫. *رُفْرَفٌ আরবী শব্দ। যার অর্থ রেশমী কাপড়, বালিশ, চাদর, মাদুর ইত্যাদি। রফরফ হ'ল সবুজ রংয়ের গদি বিশিষ্ট পাল্কী বিশেষ, এক প্রকার বাহন, যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিদরাতুল মুনতাহা থেকে আরশে মু'আল্লাকা গিয়েছিলেন।*

১২৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬, 'মি'রাজ' অধ্যায়; মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃঃ ৫।*

১২৭. *মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃঃ ৭।*

১২৮. *তদেব।*

১২৯. *শিহাবুদ্দীন সুন্নী, মাহে রজব-হুরমত মাস, মাসিক আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, নভেম্বর-১৯৯৭, পৃঃ ৯।*

خواتيم سورة البقرة তথা সূরা বাক্বারাহ্র শেষের কয়েকটি আয়াত (২৮৫-৮৬)। কারণ এ আয়াতগুলোতে উম্মতের প্রতি আল্লাহ্র অশেষ রহমত ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং (৩) وغفر لمن لايشرك بالله من أمته شيئا والمقحمات উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে যারা কখনো শিরক করেনি, তাদেরকে ক্ষমা করার সুসংবাদ। কারণ শিরক হ'ল পাপসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ *(লোক্বমান ১৩)*। মহান আল্লাহ অন্য কোন পাপের কারণে সরাসরি জান্নাত হারাম ঘোষণা করেননি শিরক ব্যতীত *(মায়েদাহ ৭২)*। আর একমাত্র শিরকের গোনাহ ছাড়া অন্যান্য গোনাসমূহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন *(নিসা ৪৮)*।

উল্লেখ্য যে, মিরক্বাত, রাদ্দুল মুহতার, মিসকুল খিতাম প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে যে, মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'আত্তাহিইয়াতু' প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অথচ একথার স্বপক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এটি ছহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী। অতএব ভিত্তিহীন এ সমস্ত বক্তব্য থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

মি'রাজের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ তথা ঊর্ধ্বলোকে গমনের উদ্দেশ্য ব্যাপক। মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুওয়াতী জীবনে মি'রাজের মত এক মহিমান্বিত ও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো মুখ্য তা হ'ল- (১) মহান আল্লাহ্র একান্ত সান্নিধ্যে হাযির হওয়া, (২) ঊর্ধ্বলোক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন, (৩) অদৃশ্য ভাগ্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ, (৪) ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, (৫) স্বচক্ষে জান্নাত-জাহান্নাম অবলোকন, (৬) পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচিত হওয়া, (৭) সুবিশাল নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ করা, এবং (৮) সর্বোপরি এটিকে একটি অনন্য মু'জিযা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

মি'রাজের শিক্ষা সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে 'আবদ' বা দাস বলে সম্বোধন করেছেন। এর মর্মার্থ এই যে, বান্দার জন্য এর চেয়ে সম্মানিত কোন নাম আল্লাহ্র কাছে নেই, থাকলে অবশ্যই সে নামে রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে সম্মানিত করা হ'ত।

আর মি'রাজের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হ'ল সর্বপ্রকার গর্ব-অহংকার চূর্ণ করে আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় দাস হওয়ার চেষ্টা করা। কারণ দাসত্বের মধ্যেই সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদা নিহিত রয়েছে। অতএব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব করা ও ছালাতের হেফাযত করাই হ'ল মি'রাজের সবচেয়ে বড় এবং মূল শিক্ষা।

মি'রাজ উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয় :

আমাদের দেশে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে মি'রাজ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, আলোচনাসভা, দো'আ, মীলাদ, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানে শবে মি'রাজের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বহু বানোয়াট কল্প-কাহিনী ও ভিত্তিহীন জাল-মওযূ' হাদীছের বর্ণনা শোনা যায়। যার দু'একটি নিম্নরূপ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখ অর্থাৎ মি'রাজ দিবসে ছিয়াম পালন করবে, তার আমলনামায় ৬০ মাসের ছিয়ামের নেকী লেখা হবে'।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ২৭ রজব (অর্থাৎ মি'রাজের রাত্রিতে) ইবাদত করবে, তার আমলনামায় একশ' বছরের ইবাদতের ছওয়াব লেখা হবে'।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতের ছালাতের ব্যাপারে ওলামায়ে ইসলাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এটি প্রমাণযোগ্য নয়।[১৩০]

মি'রাজ উপলক্ষে রজব মাসের ফযীলত সম্পর্কেও বহু জাল হাদীছ শোনা যায়। এ বিষয়ে নিম্নে কতিপয় জাল হাদীছ উদ্ধৃত হ'ল-

১. আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের প্রথম রজনীতে মাগরিবের ছালাতের পর বিশ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাছ পড়বে ...'। অতঃপর দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনুল জাউযী বলেন, হাদীছটি মওযূ।[১৩১]

২. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের দিবসে ছিয়াম পালন করবে এবং চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার প্রথম রাক'আতে একশত বার আয়াতুল কুরসী পড়বে...' ইত্যাদি ইত্যাদি। ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীছটি মওযূ। এর অধিকাংশ বর্ণনা অন্ধকার। এর সনদে ওছমান নামক রাবী মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত।[১৩২]

৩. আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের রজনীতে চৌদ্দ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা একবার, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ বিশবার, কুল

---

১৩০. *গোলাম রহমান, মাহে মে'রাজ, মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর-১৯৯৮, পৃঃ ২২।*
১৩১. *কিতাবুল মওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৩, বৈরুত ছাপা; মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর-১৯৯৮, পৃঃ ২৩।*
১৩২. *তদেব।*

আঊযু বিরব্বিল ফালাক্ব তিনবার, কুল আঊযু বিরব্বিন নাস তিনবার পড়বে। অতঃপর ছালাত হ'তে ফারেগ হয়ে দশবার দরূদ পড়বে... ' ইত্যাদি। ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীছটি মওযূ।[১৩]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত জাল হাদীছে আছে যে, রাসূল (ছাঃ) নাকি বলেছেন, 'রজব মাস আল্লাহ্র মাস, শা'বান মাস আমার মাস এবং রামাযান মাস উম্মতের মাস। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রজবের ছিয়াম পালন করবে তার জন্য আল্লাহ্র মহা সন্তোষ অবধারিত হয়ে যায় এবং তাকে তিনি জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিবেন...। যে ব্যক্তি রজব মাসে ২ থেকে ১৫টি ছিয়াম পালন করবে, তার নেকী পাহাড়ের মত হবে... সে কুষ্ঠ, শ্বেত ও পাগলামী রোগ থেকে মুক্তি পাবে। ... জাহান্নামের সাতটি দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে। ... জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খোলা থাকবে'। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি জাল।[১৪]

অতএব রজব মাসের সম্মানে বিশেষ ছিয়াম পালন করা, ২৭ শে রজবের রাত্রিকে শবে মি'রাজ ধারণা করে ঐ রাতকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা, উক্ত উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা, যিকির-আযকার, শাবীনা খতম ও দো'আর অনুষ্ঠান করা, মীলাদ ও ওয়ায মাহফিল করা, ঐ রাতের ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, সরকারী ছুটি ঘোষণা করা ও তার ফলে জাতীয় অর্থনীতির বিশাল অংকের ক্ষতি করা, ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে মি'রাজের নামে উদ্ভট সব গল্পবাজি করা, মি'রাজকে বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করতে গিয়ে অনুমান ভিত্তিক কথা বলা, ঐ দিন আতশবাজি, আলোক সজ্জা, কবর যিয়ারত, দান-খয়রাত এবং এ মাসের ফযীলত লাভের আশায় ওমরাহ পালন ইত্যাদি সবই বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত।[১৫]

পরিশেষে বলা যায় যে, মি'রাজ উপলক্ষে পালিত উল্লেখিত বিদ'আত সমূহ বর্জন করে বরং আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে এ দিনের ও মাসের সম্মানে মারামারি, খুনা-খুনি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে দূরে থাকাই বড় নেকীর কাজ। জাহেলী যুগের কাফেররাও এ মাসের সম্মানে আপোষে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখত। অথচ মুসলমানরা আজ পর্যন্ত আল্লাহ্র হুকুম মেনে তাঁর সম্মানে আপোষে হানাহানি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে বিরত হ'তে পারেনি। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মি'রাজের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধি করে শিরক-বিদ'আতসহ সর্বপ্রকার গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১৩. *তদেব*।
১৪. *মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর-১৯৯৮, পৃঃ* ২২।
১৫. *মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃঃ* ৯।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আপনি কি ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ করতে আগ্রহী? আজই যোগাযোগ করুন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

* পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ পালনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দান।
* শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ভাবে হজ্জ ও ওমরার কার্যাদি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
* হজ্জে গমনের পূর্বেই প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা।
* বায়তুল্লাহ্র সন্নিকটে বাড়ী ভাড়া।
* নিজস্ব বাবুর্চী দ্বারা রুচি সম্মত বাংলাদেশী খাবার পরিবেশন।
* নিজ হাতে কুরবানীর পশু ক্রয় ও যবেহ করার সুব্যবস্থা।
* জাবালে নূর, জাবালে ছাওর, ওহোদ, খন্দক সহ মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সফর।

॥ কম খরচে, ছহীহ-শুদ্ধভাবে হজ্জ সম্পাদনই আমাদের লক্ষ্য ॥ সেবাদানই হবে আমাদের ব্রত ॥

সার্বিক যোগাযোগ :

১। অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, পরিচালক, আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা ০১৭১১-১৬৭৭১৭।
২। মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহকারী পরিচালক, আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭; ০১৯২০৫৮৭১৮৫।
৩। মোফাক্ষার হোসাইন, অর্থ সম্পাদক, আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা ০১৭১১-৫৭৮০৫৭
৪। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সকল যেলা সভাপতি।
৫। অন্যান্য : (১) মাওলানা রবীউল ইসলাম, কাঞ্চন, ঢাকা ০১৮১৮-৭৭৭৭৪১।
(২) আমীনুল ইসলাম, রাজশাহী ০১৭৫৫-৫১৮১২৩।

গাদ্দাফী, সাম্রাজ্যবাদ ও লিবিয়ার রক্তাক্ত জনগণ

ফাহমিদ-উর-রহমান

কর্নেল মুআম্মার আল-গাদ্দাফীকে নিয়ে এক সময় তৃতীয় বিশ্বসহ আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও আবেগ লক্ষ্য করেছি। গাদ্দাফী তাঁবুতে রাত কাটান, দেশের সব মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করে তিনি তার জন্য বরাদ্দকৃত সরকারী বাসায় উঠবেন না এরকম কথা বহুবার শুনেছি। তার চিন্তা-ভাবনার আকরগ্রন্থ 'গ্রিনবুক', তার বহুকথিত ইসলামিক সোস্যালিজম, তার আধা সমাজতন্ত্র ও আধা ইসলামের মিশেল দেয়া জাতীয়তাবাদী দর্শন, ফিলিস্তীনসহ তাবৎ মযলূম মানুষের প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন তাকে এক সময় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯৭৪ সালে লাহোরে ওআইসির সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের আণবিক প্রযুক্তি অর্জনের পক্ষে দৃঢ় মতামত দেন, যা দেখে কৃতজ্ঞ লাহোরের মানুষ গাদ্দাফীর সম্মানে সেখানকার ক্রিকেট ভেন্যুর নাম 'গাদ্দাফী স্টেডিয়াম' রাখেন। শোনা যায় পাকিস্তানের আণবিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য তিনি তখন প্রচুর টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য করেন।

খুব তরুণ বয়সে ১৯৬৯ সালে গাদ্দাফী লিবিয়ার ক্ষমতায় আসেন। এর আগে তিনি ছিলেন সেখানকার সামরিক বাহিনীর অফিসার। সামরিক বাহিনীতে থাকাকালীন তিনি মিসরের জামাল আবদুন নাছেরের আরব জাতীয়তাবাদের ভক্ত হয়ে পড়েন এবং নাছেরের সমর্থনপুষ্ট ফ্রি অফিসারদের সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে। ইসরাঈলের কাছে আরবদের মর্মান্তিক পরাজয় এসব অফিসারদের মনোগঠনে সেই সময় বড় ভূমিকা রেখেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক ভাবাদর্শে তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এভাবে গাদ্দাফী নাছেরের সহযোগিতায় এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে লিবিয়ার রাজা ইদরীসকে উৎখাত করেন এবং লিবিয়াকে জ্যামহূরিয়া (Republic) ঘোষণা করেন। তিনি নিজের অভ্যুত্থানকে বলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সবার কাছে নিজেকে প্রেসিডেন্টের বদলে 'ব্রাদার গাদ্দাফী' হিসাবে পরিচয় দিতে আগ্রহ দেখান।

রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করলেও গাদ্দাফী কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা লিবিয়ায় বিকশিত হ'তে দেননি এবং সেখানে কোন বিরোধী দলের অস্তিত্বও রাখেননি। অনেকটা কমিউনিস্ট দেশের অনুকরণে বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করে তিনি দেশ চালান। যেখানে গাদ্দাফী ও তার গুটিকয়েক পরিষদের কথাই চূড়ান্ত। বিপ্লবী কাউন্সিলের আড়ালে কার্যত গাদ্দাফী নতুন এক ধরনের একনায়কতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করেন। গাদ্দাফী একবার বলেছিলেন, কেউ রাজনৈতিক দল গঠন করলে মৃত্যুই হবে তার পুরস্কার।

কিন্তু বাইরে ইসরাঈল বিরোধিতা, ফিলিস্তীন ইস্যুর প্রতি জোরালো সমর্থন, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার অবস্থান অব্যাহত থাকে। গাদ্দাফী এ সময় দেশে-দেশে বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জোগান। কিন্তু পশ্চিমারা একে বলে নাশকতামূলক কাজ। কারণ এতে তাদের স্বার্থে বিঘ্ন ঘটে। গাদ্দাফীর সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার এটা একটা অন্যতম কারণ। সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রথম দিকে তিনি পশ্চিমা তেল কোম্পানীগুলোকে তাদের ইচ্ছামত সুবিধা দিতে সম্মত হননি।

নাছেরের মৃত্যুর পর গাদ্দাফী আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন আরব দেশকে একসঙ্গে জুড়ে 'ফেডারেশন অব আরব রিপাবলিক' গঠন করার চেষ্টাও করেন। কিন্তু আরব নেতাদের কোন্দল, পারস্পরিক প্রতিহিংসা তার সে চেষ্টা সফল হ'তে দেয়নি। ১৯৮০-৯০-এর দশকে গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে পশ্চিমারা ক্ষেপে যায়, লকারবি বিমান দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বলে দুই কথিত লিবীয়কে তাদের কাছে হস্তান্তরে অস্বীকার করায়। সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমারা লিবিয়ায় অবরোধ আরোপ করে, বিমান আক্রমণ চালায় এবং সেই আক্রমণে গাদ্দাফীর পালিত পুত্র মারা যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে, গাদ্দাফী তার পশ্চিম বিরোধী ভাবমূর্তি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি। অন্যদিকে ক্ষমতা গ্রহণের প্রাথমিক অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বে তার যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল শেষ পর্যন্ত দল ও পরিবারতন্ত্রের কারণে তাও অনেকখানি ম্লান হয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকের ভাগ্যে এরকমই ঘটেছে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা থেকে সাম্রাজ্যবাদের স্রেফ মোসাহেবে পরিণত হয়েছেন। ইতিহাসের রঞ্জিত দেয়ালে গাদ্দাফীকে হয়ত আমরা এভাবেই পাঠ করব।

উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন বিরোধীদের পরিণতি এবং নিজের দেশের ওপর পশ্চিমা অবরোধের মুখে সম্ভবত গাদ্দাফী তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ত্যাগ করেন। নেলসন ম্যান্ডেলার দূতিয়ালি মেনে নিয়ে লকারবি বিমান দুর্ঘটনায় অভিযুক্তদের ব্রিটেনের কাছে ফেরত ও দুর্ঘটনায় স্বজনহারাদের কিছু সংখ্যককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তিনি পশ্চিমাদের সঙ্গে আপোষ করেন। শুধু তাই নয়, লিবিয়ার তেলের ব্যাপারে পশ্চিমাদের সুবিধা দিতেও তিনি অবলীলায় সম্মত হয়ে যান। অন্যদিকে পাকিস্তানের পরমাণু বিজ্ঞানী আবদুল কাদির খান নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উত্তর কোরিয়া ও ইরানের পাশাপাশি লিবিয়াকেও পারমাণবিক প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আপোষকামিতার জোয়ারে গাদ্দাফী সেটিও পশ্চিমাদের হাতে তুলে দেন। এজন্য আবদুল

কাদির খানকে পশ্চিমাদের হাতে কি রকম হেনস্তা হ'তে হয়েছিল তা অনেকের জানা থাকার কথা।

ক্ষমতা মানুষকে দুর্বিনীত, দুর্নীতিগ্রস্ত, শেষ পর্যন্ত ক্ষমতান্ধ করে দেয়। শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মানুষ তার বিশ্বাসকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে কুরবাণী করতে পারে গাদ্দাফী হয়তবা তার একটা বড় উদাহরণ হ'তে পারেন। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এভাবে 'বিপ্লবী' গাদ্দাফীর নৈতিক মৃত্যু ঘটে। আজ যে গাদ্দাফীকে আমরা দেখছি, তা কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের বিপ্লবী গাদ্দাফী নন, একুশ শতকের নৈতিকভাবে অবক্ষয়িত এক গাদ্দাফী। গাদ্দাফীর মোসাহেবি এতদূর পৌঁছেছিল যে পশ্চিমারা কিছুদিন আগে তাকে UN Commission on the Human Rights-এর চেয়ারম্যান পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল এবং ধীরে ধীরে তিনি পশ্চিমাদের কাছে 'সুশীল', 'আধুনিক' ও 'গুডবয়' নেতা হয়ে উঠবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

আজকে গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ উঠেছে। সেই অপরাধের শাস্তি বিধান করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমারা দল বেঁধে আকাশ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে লিবিয়ার জনগণকে রক্তাক্ত করে চলেছে। যে মানুষটি পশ্চিমের অনুমোদনে ক'দিন আগেও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন, তার বিরুদ্ধেই আজ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ। পশ্চিমাদের ভণ্ডামি, প্রতারণা, মিথ্যাচার কতদূর পৌঁছেছে এটা তার বড় প্রমাণ।

বিপ্লবী থেকে অনুগত গুডবয়ে পরিণত গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে তাহ'লে পশ্চিমারা উঠে পড়ে লাগল কেন? এর উত্তর গাদ্দাফী নিজেই। ক্ষমতারোহণের প্রথম দিকে দেশের মানুষের কল্যাণে তিনি অনেক কিছু করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরতা এড়িয়ে চলার চেষ্টাও তার ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পশ্চিমাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে গিয়ে তিনি একজন গোত্রীয় শাসকে পরিণত হন। তার পরিবার ও নিজের লোকজনের যথেচ্ছাচার, দুর্নীতি, অহমিকা এখন বহুল আলোচিত বিষয়। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে গাদ্দাফীর জনপ্রিয়তা এখন নীচে নেমে এসেছে। অন্যদিকে লিবিয়ার জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, তা পূরণ করার সামর্থ্য গাদ্দাফীর আদৌ নেই। পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো এ সুযোগটিই পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। আরব বিশ্বে আজ যে গণঅভ্যুত্থান ঘটছে, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লিবিয়ার জনগণ মাঠে নেমেছে। কিন্তু পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা লিবিয়ার জনগণের এ আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে ক্ষয়িষ্ণু গাদ্দাফীকে সরিয়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নামে নতুন একজন গুডবয়কে ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা করছে। যে কিনা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ ষোলআনা পূরণ করবে এবং কিছুদিন তথাকথিত ক্লিন ইমেজের আড়ালে এই শাসক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্ন হ'তে সাহায্য করবে। এই 'গণতান্ত্রিক' শাসকের সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদীরা লিবিয়াকে একটি লুণ্ঠন ক্ষেত্রে পরিণত করবে এবং দেশটির তেল সম্পদ পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদীদের করায়ত্ত হবে। আজকে লিবিয়ায় যে বা যারা স্বৈরাচারী গাদ্দাফীকে সরানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদকে আহ্বান করছে, তারা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাল কেটে কুমিরই ডেকে আনছে।

আর এ কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আফগানিস্তান ও ইরাকের পরে লিবিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং নির্বিচারে গণহত্যায় মেতে উঠেছে। অথচ সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়া এমনভাবে প্রপাগাণ্ডা শুরু করেছে, যাতে মনে হ'তে পারে যাবতীয় গণহত্যা কেবল গাদ্দাফী ও তার লোকজনের দ্বারাই হচ্ছে এবং গাদ্দাফীর মত নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক দুনিয়ার বুকে আর একটিও নেই।

লিবিয়ার তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এই যুদ্ধের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান অফিসিয়াল পলিসি 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্ব কার্যকর করা। কমিউনিজমের পতনের পর থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এক এক করে ইসলামপ্রধান দেশগুলোর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে এবং জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি আকথা, কুকথা বলে মুসলিম দেশগুলোকে কারবালায় পরিণত করছে। এর একটাই কারণ, পশ্চিমা পুঁজিবাদী আদর্শের বিপরীতে ইসলামকে হেয়প্রতিপন্ন করা এবং একটি সুগঠিত মতাদর্শ হিসাবে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের বিকল্প হিসাবে ইসলামের অভ্যুত্থানকে ঠেকানো। সাম্রাজ্যবাদ এ সময় শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যই বিস্তার করছে না, বরং এটি রীতিমত সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ কারণে ইসলামকে 'সভ্যতার দুশমন' বানিয়ে হাঁকডাক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ দাবী করছে তারা নাকি ইসলামী জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ইসলামী দুশমনদের হাত থেকে সভ্যতাকে রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদের এই তথাকথিত যুদ্ধ আসলে একটা বর্ণবাদী যুদ্ধও বটে। মুসলিম বিশ্বের শাসক যারা তাদের অধিকাংশই আজ সাম্রাজ্যবাদের পো-ধরা, দুর্নীতিগ্রস্ত, অযোগ্য, একই সঙ্গে স্বৈরাচারী। দেশের জনগণের ও ধর্মের জন্য এদের আদৌ কোন দরদ ও প্রতিশ্রুতি নেই। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবিলা করা এবং নিজ নিজ দেশকে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত রাখা এদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কেবল এসব দেশের জনগণের মধ্যে এক বৈপ্লবিক মৈত্রী ও জনগণকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক মতাদর্শিক লড়াই ছাড়া বিদ্যমান সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা রূপান্তর সম্ভব নয়। এসব দেশের জনগণের মধ্যে এক গণঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতি বিকাশের পথ সুগম করা সম্ভব। কারণ জনগণের অনৈক্যই সাম্রাজ্যবাদের বড় হাতিয়ার। গণঐক্য প্রতিষ্ঠাই এ মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর রণকৌশল।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

ক্লান্ত পথিক

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ওগো পথিক আর কত রবে
বৃক্ষ ছায়াতে বসি?
ক্ষণিকের তরে মায়াবিনীর এ
ছলনাকে ভালবাসি?
রবে নাকো হেথা যেতে হবে তব
আসল সে ঠিকানায়,
তবে কেন তুমি ক্ষণিকার প্রেমে?
সময় যে বয়ে যায়।
যত পার ভরো মতি ও মানিকে
পাত্র রেখ না খালি,
শ্রান্তির বোঝা সব পায়ে দলে
সম্মুখে যাও চলি।
কাটালে অলসে যেতে হবে শেষে
খালি রেখে দু'টি হাত
ঘোর অমানিশা বেড়ী দেবে আসি
না ফুটিব সুপ্রভাত।
ওগো পথিক! পাবে নাকো হেথা
হৃদয়ের ভালবাসা,
হেথা আছে শুধু ছলনায় ভরা
মিথ্যা পাওয়ার আশা।
যেথা আছে তব আপন নিবাস
ত্বরা পদে সেথা চল
মিথ্যার আবাস চুরমার কর
ক্লান্তি দু'পায়ে দলো।
আপন নিবাসে পৌঁছবে শেষে
দেখিবে নিজের দেশ,
হৃদয়ে জ্বালা রবে না সেথায়
রবে না কষ্ট-ক্লেশ।

***

শেষ নবীজির পথ

আব্দুস সাত্তার মণ্ডল
শড়গাছি, পুঠিয়া, রাজশাহী।

শেষ নবীজির পথের পথিক
এই দুনিয়ায় যারা,
শান্তি পাবেন সারা জীবন
হবেন তারাই সেরা।
আলো বাতাস হাসি কান্না
চিরকালের তরে,
আমরা কেহ থাকব না তো
থাকবে সবাই গোরে।
বাপ-দাদা আর পূর্ব-পুরুষ
নেই তো কেহ তাই
দু'দিনের এই দুনিয়াতে
নেইকো কারো ঠাঁই।

***

মানব দানব

মাহফূযুর রহমান আখন্দ
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

মায়া ভরা জোসনা নদী খাল বিল
বিষে বিষে ভরে গেছে আকাশের নীল
মেঘের মধ্যে শুনি আত্মার ডাক
উড়ে যায় একচালা ঘর।
নদী বন একাকার, ভুট্টার খই
জমে তবু কাদামাটি
পড়ে আছে ঘরে ঘরে কিষাণের মই
আপন চকিতে কেউ, কেউবা আজীবন পর।
ধেয়ে আসে ধ্বংস কান্নার মহোৎসব
লোকালয়ে ফুলকি বিভৎস রোল
মহাকাল কুড়ে খায় শিশুদের পাঠ, নিষ্পাপ বোল।
আপোষের ডাক আসে
আত্মায় জমা রেখে শয়তান আর ভুতসব
মুখ ঢাকা মুখোশে ছায়া ফেলে দয়ার মানব
কলকাঠি তার হাতে স্বরূপে সে হিংস্র দানব।
মিসাইল ফুল খায়, ছড়ায় আবেশ
রক্তের বন্যা আহা বেশ বেশ
মরুভূমি নদী খাল পদ্মার চর
আপন ছবিতে আজ সব যেন পর।

***

ফাঁকি

মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

কথায় ফাঁকি কাজে ফাঁকি
সবখানেতে চলে,
স্বার্থ হাছিল তরে মানুষ
মিথ্যা কথা বলে।
শিক্ষকে দেয় ক্লাসে ফাঁকি
ছাত্র ফাঁকি পড়ায়,
ব্যাংক অফিসে ফাঁকি দিয়ে
কেউবা টাকা কামায়।
ফাঁকি ছাড়া নেই যে কিছু
নেই যে কোন কাজ,
ফাঁকির বলেই চলছে দেখ
মোদের এই সমাজ।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (গণিত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। মূসা (আঃ)-এর। ২। ৪৪টি সূরায় ৫৩২ জায়গায়।
৩। না, তৎকালীন মিসরীয় সম্রাটদের উপাধি।
৪। মিসরের পিরামিডে। ৫। মিসরের।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। টেলিভিশন ২। ডিম ৩। মুলা
৪। কচুরিপানা ৫। আনারস

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভূগোল)

১। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা?
২। পৃথিবীর কোথায় ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত থাকে?
৩। লবণের তৈরী দ্বীপ কোথায়?
৪। কোন নগরীতে রাজপথের পরিবর্তে খাল আছে?
৫। কোন দেশে রাতে রংধনু দেখা যায়?

সংগ্রহে : এফ.এম. লিটন বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (উদ্ভিদ বিষয়ক)

১। কোন উদ্ভিদের ফুলের পরাগায়ন হয়; কিন্তু ফুল হ'তে ফল হয় না?
২। কোন সবজির ফুল থেকে ফল হয়, কিন্তু ফল কোন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না?
৩। কোন উদ্ভিদের ফুল ও ফল হয় না, শুধু পাতাই ব্যবহার করা হয়?
৪। কোন বৃক্ষের ফুল মানেই জীবনের শেষমুহূর্ত?
৫। কোন গুল্ম ও বৃক্ষের দেহ অসংখ্য কাঁটাযুক্ত?

সংগ্রহে : বাশীর
রামপুরহাট, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৭ এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর গোমস্তাপুর থানাধীন জালিবাগান হাফিযিয়া মাদরাসায় সোনামণি চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অনুষ্ঠানে হাফেয আনোয়ারকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনমণি চাঁপাই নবাবগঞ্জ (উত্তর) যেলা পুনর্গঠন করা হয়। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র যেলা উপদেষ্টা মুখতাররুল ইসলাম।

কাযিরপাড়া, পুঠিয়া, রাজশাহী ১৮ এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর কাযিরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভাড়ুয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ সাবুর আলী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করে যথাক্রমে ছোট্ট সোনামণি মোস্তাকীম ও রেখা খাতুন।

সিরাজগঞ্জ ২৯ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় শহরের রেলওয়ে কলোনীতে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি সিরাজগঞ্জ যেলার সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ।

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২৯ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় বড়কুড়া মক্তবে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি সিরাজগঞ্জ যেলার পরিচালক হাসান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। প্রশিক্ষণ শেষে বাদ জুম'আ যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা 'সোনামণি'র সাবেক সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিনকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি সিরাজগঞ্জ যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

জলাইডাংগা, মিঠাপুকুর, রংপুর ৪ মে বুধবার : অদ্য বাদ আছর জলাইডাংগা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব। অনুষ্ঠানে আলমগীর হোসাইনকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি রংপুর যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

ঝাড় আমবাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর ৫ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ ফজর ঝাড় আমবাড়ী দারুস সালাম মহিলা হাফিযিয়া মাদরাসা ও ইয়াতীম খানায় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বযলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম ৫ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, রাজশাহী মহানগরী সোনামণি-এর পরিচালক ওবাইদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে হাফেয ওবাইদুল্লাহকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

সচেতন হও

শারমীন আখতার
মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।

একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে
যেতে হবে সবাইকে
মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে
অন্ধকার ঐ কবরে।
অসৎ পথে সঞ্চয় করা
ধন-দৌলত আর অট্টালিকা,
এ সবকিছুই থাকবে পড়ে
শুধু কাফন তোমার সঙ্গী হবে।
থাকতে সময় হও সচেতন
আল্লাহ্র হুকুম করতে পালন,
নইলে কিন্তু শেষ বিচারে
যেতে হবে ঐ দোযখে।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ফৎওয়া বৈধ ঘোষণা করল সুপ্রিমকোর্ট

সব ধরনের ফৎওয়া নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বাতিল করেছে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে ফৎওয়াকে বৈধ ঘোষণা করেছেন দেশের সর্বোচ্চ এ আদালত। আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেছেন যে, শিক্ষিত ও সমাজের গ্রহণযোগ্য আলেম-ওলামা ফৎওয়া দেবেন। তবে গ্রাম্য শালিশে ফৎওয়ার নামে কাউকে অযথা শাস্তি দেয়া বা কারো সাংবিধানিক অধিকার হরণ করা যাবে না। প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগ গত ১২ মে এ রায় দেন। বেঞ্চের অন্য বিচারপতিরা হ'লেন- বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি মুহাম্মাদ ঈমান আলী।

ফৎওয়া নিষিদ্ধের প্রেক্ষাপট : ২০০০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নওগাঁ যেলার সদর থানার কীর্তিপুর ইউনিয়নের আতিয়া ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের সাইফুল ইসলাম তার স্ত্রী শাহিদাকে তালাক দেয়। শাহিদা তার বাপের বাড়িতে চলে যাওয়ার কয়েক মাস পরে সাইফুল তাকে আবার ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। এতে এলাকায় শালিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাহিদাকে তার স্বামী সাইফুলের চাচাতো ভাই শামসুল ইসলামের সঙ্গে হিল্লা বিয়ে দেয়া হয়। পরে সাইফুল তার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে অসম্মত হ'লে পুনরায় শালিশ হয়। এতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সদর থানার পুলিশ কর্মকর্তারা একত্রিত হয়ে সাইফুল ও শাহিদাকে আবার বিয়ের সিদ্ধান্ত দেন। সেই মোতাবেক তাদের বিয়ে হয়। এ ঘটনাটি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হ'লে ঐ বছরই বিচারপতি গোলাম রব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টি আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি রুল জারি করেন। রুলের শুনানী শেষে বিচারপতি গোলাম রব্বানী ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারী সব ধরনের ফৎওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ঐ রায়ের বিরুদ্ধে ঐ বছরই মুফতী মুহাম্মাদ তৈয়্যব ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আপিল করেন। ১০ বছর ঝুলে থাকার পর এ বছর ১৪ ফেব্রুয়ারী এটি শুনানীর জন্য আপিল বিভাগে উঠে। আদালত এ শুনানীকালে ৯ জন এমিকাস কিউরি ও পাঁচজন বিজ্ঞ আলেমের মতামত নেন। শুনানীকারী আইনজীবীদের বক্তব্য এবং এমিকাস কিউরি ও আলেমগণের মতামত আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে আপিল বিভাগ আলোচ্য রায় প্রদান করেন।

এনার্জি ড্রিংকসের আড়ালে মাদক বিক্রি

এনার্জি ড্রিংকস নামক পানীয়ের আড়ালে মাদক বিক্রি হচ্ছে রাজধানীসহ সারাদেশে। বৈধতার সনদ নিয়ে অবৈধভাবে এ ধরনের ড্রিংকস অবাধে বাজারে বিক্রি করে একটি মহল পরিকল্পিতভাবে বছরে পাঁচ হাযার কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে। ১৪ শতাংশ পর্যন্ত এ্যালকোহল মিশ্রিত ফেনসেডিলের বিকল্প হিসাবে এসব কোমল পানীয় খেয়ে যুবসমাজ মাদকাসক্ত হওয়ার কারণে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে গোটা সমাজে। বর্তমানে বাজারে প্রচলিত এসব এনার্জি ড্রিংকসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- স্পিড, ব্ল্যাক হর্স, বিগবস, শার্ক, টাইগার, রয়েল হর্স ফিলিংস, রেড টাইগার, লায়ন প্রভৃতি।

দেশে তামাক ব্যবহারে বছরে ১২ লাখ লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে

দেশে তামাক ব্যবহারে বছরে ১২ লাখ লোক ৮ ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। রোগীদের মধ্যে ২৫ শতাংশ হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। এই খাতে বছরে ৫ হাযার কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সুপ্রিমকোর্টের রায়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবৈধ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে অবৈধ ও বেআইনী ঘোষণা করেছেন সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে গত ১০ মে এ রায় ঘোষণা করেছেন প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের ফুলবেঞ্চ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের এ রায় এখন থেকে কার্যকর হওয়ার কথা বলা হ'লেও আগামী দু'টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন এ ব্যবস্থার অধীনেই হতে পারে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত তার রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেছেন যে, দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে পরবর্তী ১০ম ও ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হ'তে পারে। তবে এর সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত কোন প্রধান বিচারপতি কিংবা আপিল বিভাগের অন্য কোন বিচারপতিকে জড়ানো যাবে না। বিদায়ী প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের বিচারপতিদের বাদ রেখে সংসদ চাইলে আগামী সংসদ নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংস্কার করতে পারবে।

সেমিনারে তথ্য

ফারাক্কা বাঁধে সরাসরি ক্ষতি ১ লাখ ৫৫ হাযার কোটি টাকা

ফারাক্কা বাঁধের কারণে বিগত ৩৬ বছরে বাংলাদেশের ১ লাখ ৫৫ হাযার ৪শ' কোটি টাকার সরাসরি ক্ষতি হয়েছে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংসসহ পরিবেশের ক্ষতি ধরলে পরোক্ষ ক্ষতির পরিমাণ এর ছয়গুণ হবে। 'ফারাক্কা ও আজকের বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় গত ১৭মে বক্তারা এ তথ্য পেশ করেন।

রাজধানীতে ২০ হাযার পথবাসী

খোলা আকাশের নীচে চরম দারিদ্র্যের মাঝে শুধু রাজধানীতেই দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে ২০ হাযার পথবাসী। 'কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের জরিপ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এরা ১০ বছর বা তারও বেশী সময় ধরে রাস্তায় বসবাস করছে। এদের অনেকের জন্ম হয়েছে রাস্তাতেই।

বিদেশ

পালিয়ে বিয়ে করার অপরাধে ভারতে পাথর মেরে হত্যা

ভারতের উত্তরাঞ্চলের রাজীব ভার্মা ও রাণু পাল নামের এক যুগলকে পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার অপরাধে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে। বর ও কণের বর্ণবৈষম্য থাকায় এ বিয়েতে দুই পক্ষের অভিভাবকেরা বিরোধিতা করে। ফলে তারা পালিয়ে বিয়ে করার একদিন পর গ্রামে ফিরে এলে মেয়েটির পরিবারের নেতৃত্বে উত্তেজিত জনতা তাদের পাথর মেরে হত্যা করে। পুলিশ হত্যার দায়ে ৮জনকে গ্রেফতার করেছে।

দেনার দায়ে যুক্তরাষ্ট্রে আরো ৬টি ব্যাংক দেউলিয়া

দেনার দায়ে ১৫ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ৬টি ব্যাংকে লালবাতি জ্বলেছে। এ নিয়ে এ বছরে মোট ৩৪ ব্যাংকে লালবাতি জ্বলল। গত বছর ৯২ বিলিয়ন ডলার দেনার দায়ে ১৫৭টি ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে। এর আগের বছর ১৬৯ বিলিয়ন ডলার দেনার দায়ে বন্ধ হয়েছে ১৪০টি ব্যাংক। এ নিয়ে ওবামার আমলে এ পর্যন্ত মোট ৩৩১টি ব্যাংক অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

নিউইয়র্কের ৬ হাযার শিক্ষক চাকরি হারাচ্ছেন

নিউইয়র্ক নগরীর মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ ২০১২ সালের জন্য গত ৬ মে ব্যয়সাশ্রয়ী ৬ হাযার ৫৬০ কোটি ডলারের বাজেট ঘোষণা করেছেন। এর ফলে নিউইয়র্কের ৬ হাযারের বেশী শিক্ষক তাদের চাকরি হারাবেন। বাজেটে অর্থায়ন কমানোর জন্য ব্লুমবার্গ নিউইয়র্ক স্টেট ও ওয়াশিংটনের কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে অর্থায়ন হ্রাসকে দায়ী করেন।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ১২৮ লাখ কোটি ডলার

আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের পিছু ধাওয়াসহ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২৮ লাখ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে আট হাযার ৬০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে ইরাক যুদ্ধে এবং ৪৪ হাযার ৪০০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে আফগানিস্তানে। কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিস সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গুজরাটের দাঙ্গায় মুসলিম নিধনের সুযোগ করে দিতে নির্দেশ দেন নরেন্দ্র মোদি

ভারতের গুজরাট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০০২ সালের মুসলিম বিরোধী ভয়াবহ দাঙ্গার সময় দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের না ঠেকাতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে পদস্থ এক পুলিশ কর্মকর্তা ভারতের সুপ্রিমকোর্টে এফিডেভিটে দেয়া সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় পুলিশ কর্মকর্তা সঞ্জিব ভাট গত ২২ এপ্রিল সুপ্রিমকোর্টে দাঙ্গা সম্পর্কিত মামলায় এ এফিডেভিট দেন। উল্লেখ্য, ঐ ঘটনায় দুই হাযারেরও বেশী মুসলমান নিহত হন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৭ জনে ১ জন দরিদ্র জীবনযাপন করে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতি ৭ জনের মধ্যে ১জন প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন-যাপন করে। ৩১ কোটি মার্কিনীর মধ্যে চার কোটি ৭০ লাখই দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করছে। এছাড়া মার্কিন শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে তিনগুণ বেশী দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটায় আফ্রিকান ও লাতিন আমেরিকান বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকরা। মার্কিন সেন্সাস ব্যুরোর নতুন পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বাবরী মসজিদ মামলার রায় স্থগিত করেছে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট

ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের অযোধ্যার ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদের জমি বিতর্ক মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে সেদেশের সুপ্রিমকোর্ট। বিচারপতি আফতাব আলম এবং বিচারপতি আর এস লোধার ডিভিশন বেঞ্চ এলাহাবাদ হাইকোর্টের লাক্ষ্ণৌ বেঞ্চের রায়কে বিস্ময়কর আখ্যা দিয়েছে। কারণ এ মামলায় আবেদনকারীদের কোন পক্ষই জমি ভাগাভাগির আবেদন জানায়নি, তা সত্ত্বেও এলাহাবাদ হাইকোর্টের লাক্ষ্ণৌ বেঞ্চ মসজিদের জমিকে তিন ভাগ করে তিন বাদী পক্ষকে দেওয়ার রায় দিয়েছে।

কঙ্গোতে প্রতিদিন ১১০০ নারী ধর্ষিত হচ্ছে

কঙ্গোতে প্রতিদিন এগারো শতাধিক নারী ধর্ষিত হচ্ছে। আমেরিকার 'জার্নাল অব পাবলিক হেলথ' নামের এক সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সাময়িকীতে জানানো হয়, আফ্রিকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ কঙ্গোতে ২০০৬ সাল থেকে ২০০৭ টানা এক বছর গবেষণাটি চালানো হয়। এ সময়ে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী চার লাখেরও বেশী নারী ধর্ষিত হয়।

বিশ্বে প্রতি বছর একশ' কোটি টনের বেশী খাদ্য অপচয় হয়

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) গত ১১মে বলেছে, প্রতি বছর বিশ্বে খাদ্য উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ১৩০ কোটি টন বিনষ্ট অথবা অপচয় হয়। এফএও জানায়, প্রতি বছর যে পরিমাণ খাদ্য বিনষ্ট অথবা অপচয় হয় তা বিশ্বে বার্ষিক উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকেরও বেশী। অথচ বিশ্বের প্রায় ৯২ কোটি ৫০ লাখ মানুষ ক্ষুধায় ভুগছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ভোক্তারা প্রতি বছর ৯৫ থেকে ১১৫ কিলোগ্রাম (২০৯ পাউন্ড থেকে ২৫৩ পাউন্ড) খাদ্য অপচয় করে থাকে। শিল্পোন্নত দেশগুলো প্রতি বছর ৬৭ কোটি টন খাদ্যদ্রব্য বিনষ্ট করে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোয় এর পরিমাণ ৬৩ কোটি টন। অন্যদিকে ধনী দেশগুলো প্রতিবছর ২২ দশমিক ২ কোটি টন খাদ্যদ্রব্য অপচয় করে।

মুসলিম জাহান

মিসরের অধিকাংশ মানুষ ইসলামী শাসনের পক্ষে

মিসরের অধিকাংশ নাগরিক দেশটিতে ইসলামী শাসন চায় বলে সম্প্রতি দেশটিতে চালানো এক জনমত জরিপে বলা হয়েছে। আধা-সরকারী 'আল-আহরাম' পত্রিকার পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, মিসরের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চায়। অন্যদিকে শতকরা ২৫ ভাগ মানুষের পছন্দ শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক সরকার। শতকরা মাত্র ৪ ভাগ মানুষ সেক্যুলার শাসন ব্যবস্থার পক্ষে মত দিয়েছে। এছাড়া শতকরা তিন ভাগ মানুষ মনে করে, মিসরের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সামরিক শাসন যরূরী। তীব্র গণআন্দোলনের মুখে সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারকের পতনের দু'মাসেরও বেশী সময় পরে মিসরে এ জনমত জরিপ চালানো হয়।

ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যু

৯/১১-এর হোতা বলে কথিত আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন গত ২রা মে রাতে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদের একটি বাড়িতে মার্কিন সেনা হামলায় নিহত হয়েছেন। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে মাত্র ৯০ কিঃমিঃ দূরের সেনাশহর অ্যাবোটাবাদের ঐ দোতলা বাড়িতে গত ৬ বছর ধরে নাকি তিনি বসবাস করে আসছিলেন। ওসামাকে হত্যার দায়িত্ব পালন করে মার্কিন বিশেষ কমান্ডো বাহিনী 'ইউএস নেভি সিল'। বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বর শত্রু ওসামাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল দেশটি। অবশেষে গত বছর আগষ্ট মাসে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ উক্ত বাড়িটিকে শনাক্ত করে। তখন থেকে তারা বাড়িটির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল। অতঃপর ২রা মে গভীর রাতে আফগানিস্তান থেকে গোপনে পাকিস্তানী রাডারকে ফাঁকি দিয়ে ৭৯ সদস্যের মার্কিন মেরিন সেনার একটি দল চারটি হেলিকপ্টার নিয়ে অবতরণ করে ঐ বাড়ির আঙিনায়। মার্কিন সূত্র মতে মাত্র ৪০ মিনিটেই বিন লাদেন হত্যা অভিযান শেষ হয়। গুলী করে হত্যা করা হয় বিন লাদেন সহ অন্যদেরকে। এরপর তারা দ্রুত ওসামার লাশ হেলিকপ্টারে করে আফগানিস্তানে তাদের সেনাঘাঁটিতে নিয়ে যায়। অতঃপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাকে আরব সাগরে মোতায়েন একটি সেনা জাহাযে স্থানান্তর করা হয় এবং বিন লাদেনের অনুসারীরা যাতে লাশকে ঘিরে 'মাযার' গড়ে তুলতে না পারে সেজন্য তার লাশ সাগরে সমাহিত করা হয়।

এদিকে ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী নানা জল্পনা-কল্পনার ডানা মেলছে প্রতিনিয়ত। বের হচ্ছে নিত্য-নতুন তথ্য। 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় গত ১২মে "Dead Osama was brought into Abbotabad and killed" শিরোনামে পত্রিকাটির ওয়াশিংটন প্রতিনিধি জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগেই ওসামাকে হত্যা করা হয়। ঘটনার দিন বরফ কফিনে ভরা ওসামার লাশ নিয়ে এসে অ্যাবোটাবাদের ঐ বাড়িতে হত্যার নতুন নাটকটি সাজায় যুক্তরাষ্ট্র। ঐ সূত্র মতে, আফগানিস্তানের বাগরাম বিমানঘাঁটিতে ওসামার লাশ এতদিন সংরক্ষিত ছিল।

মার্কিন সামরিক ও পররাষ্ট্র বিষয়ক সাময়িকী 'ভেটেরান্স টুডে'র সিনিয়র সম্পাদক গর্ডন ডাফ বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নকল বিন লাদেনকে হত্যা করেছে। আসল বিন লাদেন বহু বছর আগেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এক মার্কিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিন লাদেন মারা যান বলে তিনি দাবী করেন। তিনি আরো বলেন, বিন লাদেনের অনুরূপ চেহারার এক ব্যক্তিকে এতদিন আটকে রেখে তাকে ২রা মে হত্যা করা হয়। ইরানের গোয়েন্দামন্ত্রী হায়দার মুছলেহী বলেছেন, মার্কিন অভিযানের অনেক আগেই বিন লাদেন রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান বলে তার কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে। বিশ্লেষকগণ মনে করছেন, আফগানিস্তান থেকে পালাবার অজুহাত তৈরী করা, পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে পারমাণবিক অস্ত্র দখল করা এবং আগামী নির্বাচনে ওবামার জয়ের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে এই নাটক সাজানো হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

শিশুদের বেশী টিভি দেখা ঝুঁকিপূর্ণ

অস্ট্রেলিয়ার 'ওয়েস্টমিড মিলেনিয়াম ইনস্টিটিউট'-এর সেন্টার ফর ভিশন রিসার্চ-এর বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ৬/৭ বছর বয়সী শিশুরা যদি অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখে তাহ'লে তাদের পরবর্তী জীবনে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশী বেড়ে যায়। সিডনির ৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় দেড় হাযার শিশুর উপর গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। এসব শিশু গড়ে প্রতিদিন প্রায় দুই ঘণ্টা করে টিভি দেখেছে।

শব্দখেকো পর্দা

সম্প্রতি সুইডেনের গবেষকরা হালকা ওযনের এক ধরনের পর্দা উদ্ভাবন করেছেন, যার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল শব্দ শুষে নেয়ার ক্ষমতা। জানা গেছে, দেয়াল এবং পর্দার মধ্যে ১৫ সেন্টিমিটার ফাঁকা জায়গা রেখে পর্দাটি টানাতে হবে। এর ফলে পর্দাটি শব্দ তরঙ্গ শুষে নিতে পারবে, যা সাধারণ পর্দার চেয়ে পাঁচগুণ বেশী শব্দ নিরোধী। অস্বচ্ছ কিন্তু সহজেই আলোকভেদী গুণের কারণে এই পর্দা বাড়ির জানালা-দরজা ছাড়াও শব্দ প্রবেশ করে এমন সব জায়গাতেই ব্যবহার করা যাবে।

ভিডিও গেমসে আসক্ত শিশুদের মোটা হওয়ার ঝুঁকি

চিলড্রেন্স হসপিটাল অব ইস্টার্ন অন্টারিও রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিচালিত 'ভিডিও গেম প্লেইং ইনক্রিজেস ফুড ইনটেক ইন অ্যাডোলেসেন্টস : এ র‍্যানডোমাইজড ক্রসওভার সার্ভে' শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু ভিডিও গেমস খেলে, তারা অন্য শিশুদের তুলনায় প্রতিদিন গড়ে ১৬৩ কিলোক্যালরি অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করেছে। এতে তারা মোটা হচ্ছে, বাড়ছে রোগের ঝুঁকি। তাছাড়া ভিডিও গেমস খেলার সময় কিশোরদের হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তচাপ ও মানসিক কাজের চাপ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বেশী থাকে। এদিকে সম্প্রতি বারডেম পরিচালিত গবেষণায় রাজধানী ঢাকার উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুদের মধ্যে স্থূলতার হার বাড়ার তথ্য পাওয়া গেছে। এতে দেখা গেছে, হাসপাতালটিতে টাইপ-২ ডায়াবেটিস নিয়ে যত শিশু আসছে, তার ৮০ ভাগই স্থূলকায়। তাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বইয়ের টাওয়ার!

'দ্য টাওয়ার অব বাবেল' নামে ছয়তলাবিশিষ্ট পেঁচানো একটি দৃষ্টিনন্দন টাওয়ার সম্প্রতি আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সের কেন্দ্রস্থল প্লাজা সান মার্টিনে উন্মোচন করা হয়েছে। টাওয়ারটির প্রতিটি তলার ভিত্তি ইস্পাতে গড়া হ'লেও এর বাইরের দেয়াল তৈরী করা হয়েছে ৩০ হাযার বই দিয়ে। ৮২ ফুট (২৫ মিটার) উঁচু টাওয়ারটি নির্মাণের জন্য পাঠক, গ্রন্থাগার ও ৫০টির মতো দূতাবাস থেকে বইগুলো অনুদান হিসাবে পাওয়া গেছে। বইগুলোর মধ্যে দর্শন থেকে শুরু করে শিশুতোষ সাহিত্য পর্যন্ত রয়েছে। এই টাওয়ারটির নকশাকার হ'লেন বিশ্বখ্যাত শিল্পী মার্তা মিলুহিন।

শিশুর আচরণে মায়ের দুধের প্রভাব

যেসব শিশু ৪ মাস বা তার বেশী সময় ধরে মায়ের দুধ পান করে তাদের আচরণ ভাল হয়। তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আসক্তি, মিথ্যা বলা এবং চুরি করার মতো প্রবণতা থাকে খুবই কম। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সাম্প্রতিক এক গবেষণার পর এ তথ্য জানিয়েছেন। গবেষকরা তাদের গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন ১০ হাযার ৩৭ জন মা এবং তাদের শিশুদের কাছ থেকে। তারা বলছেন, বুকের দুধ খাওয়ানোর ফলে মা ও শিশুদের মধ্যে সম্পর্কটাও হয় অত্যন্ত সুনিবিড়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন
স্বাধীনতার মূল চেতনা অক্ষুণ্ন রাখুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

মেহেরপুর ৮ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরের শামসুযযোহা পার্কে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উভয় বাংলার মানুষ বাংলাভাষী হ'লেও এপার বাংলার মানুষ আজ পৃথকভাবে স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মূলতঃ তাদের ইসলামী চেতনার কারণে। এই মৌল চেতনা ভুলিয়ে দিতে পারলেই উভয় বাংলাকে এক করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা খুবই সহজ হবে। যার ফলাফল হবে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিলুপ্তি। যা না থাকলে আমরাই বিলুপ্ত হয়ে যাব। তিনি বলেন, ১৯৭১-এর ১৭ই এপ্রিল তারিখে এই যেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম বৈদ্যনাথ তলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার কায়েম হয়। তাই এদেশের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে মেহেরপুর যেলা একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ বিদেশী সংস্কৃতি এবং শিরক ও বিদ'আতের জয়জয়কার চলছে। এমনকি নিবিষ্ট মনে ইবাদতের জন্য মসজিদে যাবেন, সেখানেও শিরকের নিদর্শন শোভা পাচ্ছে। মেহরাবের একদিকে 'আল্লাহ' অন্যদিকে 'মুহাম্মাদ' অথবা কেবল ক্বিবলার দিকে 'আল্লাহ' খচিত সুদৃশ্য টাইল্স লাগানো হচ্ছে। সামনে কা'বা ঘর বা মসজিদে নববীর ছবি, উপরে কালেমা ত্বাইয়েবার সাথে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' যোগ করে লিখে রাখা হয়েছে। এসবই স্পষ্ট শিরক। তিনি বলেন, স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনো এক হ'তে পারে না। সেকারণ আল্লাহ ও মুহাম্মাদ কখনো একসঙ্গে টাঙ্গিয়ে রাখা যাবে না। তিনি বলেন, মুসলমান 'আল্লাহ' নামক কোন শব্দের পূজা করে না। বরং অদৃশ্য আল্লাহ্র ইবাদত করে। তিনি বলেন, আক্বীদার পাশাপাশি আমলের ক্ষেত্রে চলছে অগণিত বিদ'আতযুক্ত আমল। ভাল-র দোহাই দিয়ে আমরা ইসলামকে নিজেদের মন মতো সাজিয়ে নিতেই বরং বেশী তৎপর। অথচ শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও বিদ'আত মুক্ত ছহীহ সুন্নাহ্র বাস্তব অনুশীলন ব্যতীত পরকালে নাজাত পাওয়ার উপায় নেই। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সকলকে এই দাওয়াতী কাফেলায় শরীক হয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

স্থানীয় যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আলহাজ্জ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন ও মেহেরপুরের অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব হোসেন আলী খন্দকার। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল মুমিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

টাঙ্গাইল ২৫ এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে ধনবাড়ী থানাধীন কেরামজানী উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলাম ফিৎরাতের ধর্ম। আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-এর পিঠের ডান পার্শ্বে হাত রেখে সাদা পিঁপড়ার মত রূহ সমূহকে বের করেন। অতঃপর পিঠের বাম পার্শ্ব থেকে কালো পিঁপড়ার মত রূহ সমূহকে বের করে এনে বনু আদমের নিকট থেকে তাওহীদের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন। আমরা সকলেই সেদিন আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে দুনিয়ায় এসেছি। কিন্তু শয়তানী ধোঁকায় আল্লাহ্র একত্ববাদকে ভুলে আমরা বহুত্ববাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে জাহান্নামের খোরাক বানিয়েছি। আমাদের বাপ-মা বা আমাদের সমাজ আমাদেরকে ইহুদী, নাছারা, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজারী কবর পূজারী, মুশরিক বানিয়ে ফিৎরাতের মূল রূহ তথা ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে আমরা চলেছি জাহান্নামের পথে। তাই আমাদেরকে সকল শয়তানী পথ ছেড়ে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র পথে চলতে হবে। তাহ'লেই মিলবে জান্নাতের পথের ঠিকানা।

টাঙ্গাইল যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াজেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, নরিল্যা মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আশরাফ ফারূক, শিমলা স্কুল এণ্ড কলেজের প্রভাষক আল-মামূন, মাওলানা সুরূযযামান (সরিষাবাড়ী), আব্দুল্লাহেল কাফী (দিগপাইত) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী।

অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস নিয়ে আগমন করেন বিশ্ব মানবতার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা ১৪ই মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ

আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার যৌথ উদ্যোগে নগরীর ঐতিহ্যবাহী আব্দুর রাযযাক পার্কে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, মতবাদ বিক্ষুব্ধ পৃথিবী যখন অশান্তির দাবানলে জ্বলছিল, ঠিক তখনই শান্তির অমীয় বাণী নিয়ে হাযির হন জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী মহামানব, রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' (আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই)-এর দাওয়াত সমস্ত ত্বাগূতী শক্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আরবের শুষ্ক মরুভূমিতে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দেয়। মরুচারী আরব জাতি বিশ্ব বিজয়ী শক্তিতে পরিণত হয়। ধরাধাম শান্তির আবাসভূমিতে পরিণত হয়ে মানবতা পায় মহা সফলতা। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ইসলামের সেই আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, যা মানবতাকে সেই মহা সত্যের আহ্বান জানায়। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন তাওহীদের কালেমাকে বুকে ধারণ করেই সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছে। এ আন্দোলন মানুষের সার্বিক জীবনকে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে চায়। অতএব আসুন! আমরা সার্বিক জীবনে এলাহী বিধানের কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করি। সফলতা একদিন আমাদের পায়ে লুটাবেই ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম ও ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম, 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রবীণ সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ ইদরীস আলী, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তারীকুযযামান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, মেহেরপুর শহর শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আযীমুদ্দীন বিশ্বাস, একই শাখার অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ আবুল হোসাইন, প্রচার সম্পাদক জনাব রফীকুল ইসলাম ও গাংনী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মেহেরপুরের সহ-সভাপতি জনাব মোশাররফ হোসাইন প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে মেহেরপুর হ'তে ছয় জনের উক্ত দলটি নিজস্ব গাড়ী যোগে আগের দিন ১৩ মে শুক্রবার সাতক্ষীরা পৌঁছেন। তারা বুলারাটিতে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পৈতৃক বাড়ীর শূন্য ভিটা, বাঁকাল ইসলামিক কমপ্লেক্স ও সুন্দরবন সহ সাতক্ষীরার গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ পরিদর্শন করেন। অতঃপর সম্মেলনে যোগদান করেন।

এবারের সম্মেলনে উপস্থিতি সংখ্যা ছিল বিগত বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশী। যেলার বিভিন্ন শাখা ও এলাকা থেকে বাস, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, ইঞ্জিন চালিত ভ্যান যোগে হাযার হাযার পুরুষ ও মহিলা যেলা সম্মেলনে যোগদান করেন। মহিলাদের জন্য পৃথক প্যাণ্ডেল ও প্রজেক্টরের ব্যবস্থা ছিল। মহিলাদের উপস্থিতি প্যাণ্ডেল ছাড়িয়ে গেলে দু'দফা প্যাণ্ডেল বৃদ্ধি করতে হয়।

সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়ার ছাত্র আবু রায়হান ও বুরহানুদ্দীন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক ও বর্তমান সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম। সম্মেলনে দেশের সরকার, প্রশাসন ও জনগণের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দাবী ও প্রস্তাবনা সমূহ পাঠ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।-

১. দেশের আইন ও শাসন বিভাগকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।
২. শিক্ষার নিম্নস্তর হ'তে উচ্চস্তর পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৩. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিশেষ করে কৃষকদের জন্য সূদমুক্ত কৃষিঋণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
৪. যুব চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল বই, পত্রিকা, ছবি প্রদর্শন এবং বিদেশী অপসংস্কৃতির আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে।
৫. এ সম্মেলন দেশের আইন-শৃংখলা বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছে।
৬. এ সম্মেলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক দখল, ফিলিস্তিনীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মিসর, লিবিয়া, সিরিয়া সহ মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রের নামে গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং সেখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ এবং ও,আই,সির প্রতি জোরালো আহ্বান জানাচ্ছে।
৭. এ সম্মেলন সরকার ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ঢেলে সাজাবার আহ্বান জানাচ্ছে এবং ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দাবী জানাচ্ছে।
৮. এ সম্মেলন বিদেশে নারী গৃহকর্মী না পাঠানোর জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।
৯. বিগত ২০০৫ সালে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের উপর আরোপিত মিথ্যা মামলা সমূহের অবশিষ্ট মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী দু'হাত উঁচু করে মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উক্ত প্রস্তাব সমূহের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

সুধী সমাবেশ

আল্লাহ প্রদত্ত আমানত সংরক্ষণে সচেষ্ট হউন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গাইবান্ধা-পূর্ব, ৯ মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার সাঘাটা থানাধীন আমদির পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, মুনাফিকের অন্যতম আলামত হচ্ছে- আমানতে খেয়ানত করা। আর কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী মুনাফিকদের স্থান হচ্ছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। তিনি বলেন, আমাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এখানকার শিমুলবাড়ী মাদরাসা এবং উক্ত মাদরাসা পরিচালনার জন্য ক্রয়কৃত ২৮ বিঘা জমি ও জুমারবাড়ী নূরা জাহিম হাসপাতাল অত্রাঞ্চলের অধিবাসীদের নিকটে আল্লাহ্র পবিত্র আমানত। আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনাদের। এর সামান্যতম খেয়ানত হ'লে ক্বিয়ামতের দিন বিচারের কাঠগড়ায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে। যারা ঐ জমি বিক্রি করবে এবং যারা খরীদ করবে, উভয়ে খিয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি শিমুলবাড়ী মাদরাসা ও জুমারবাড়ী হাসপাতালের বর্তমান বেহাল দশার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এগুলিকে রক্ষার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি গ্রামে গ্রামে সংগঠন কায়েম করে সম্মিলিতভাবে সর্বত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহসান আলী প্রধান -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা মাহবূবুর রহমান, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা ফজলুর রহমান, স্থানীয় মনছুরহাট হাইস্কুলের শিক্ষক মাওলানা আব্দুল জলীল, জালালিয়া হাফেযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আনীসুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, ঐদিন বিকালে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় সমাবেশের জন্য পূর্ব নির্ধারিত স্থান বাদিনার পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হওয়ায় পার্শ্ববর্তী আমদিরপাড়া জামে মসজিদ ও তৎসংলগ্ন ঈদগাহ ময়দানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় যুবকেরা ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ১৮টি মোটর সাইকেলে করে ১২ কিলোমিটার দূরবর্তী সোনাতলা থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যায় এবং রাত ৮-টার দিকে তিনি সেখানে পৌঁছেন। অতঃপর রাত্রি ১১-টা পর্যন্ত পিন পতন নীরবতায় ঠাসাঠাসি বসে কষ্ট করে শ্রোতাগণ সাগ্রহে বক্তব্য শ্রবণ করেন। সম্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ভোররাতে রাজশাহী মারকাযে এসে পৌঁছে যান। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

সার্বিক জীবনে সুন্নাহ্র পূর্ণ অনুসারী হউন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নগরঘাটা, সাতক্ষীরা ১৫ মে, রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার তালা থানাধীন নগরঘাটা- চোখারকান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ব্যতীত পরকালে নাজাত পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ সুন্নাহ্র নামে চারদিকে চলছে বিদ'আতের ছড়াছড়ি। যঈফ, জাল ও বানাওয়াট হাদীছকে পুঁজি করে এমনকি স্রেফ কল্পকাহিনী ছড়িয়ে একশ্রেণীর লোক তাদের ব্যবসা জমজমাট রেখেছে। ছহীহ হাদীছের বাণী তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। ফলে সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দানের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্ভেজাল ও স্বচ্ছ দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নেমেছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত এককভাবে সমাজ সংস্কার সম্ভব নয়। তিনি সকলকে 'আন্দোলন'-এর ইমারতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী কারাবরণের পর থেকে মা-বোনদের প্রাণভরা দো'আ ও তাদের অবদানের কথা স্মরণ করে আবেগময় কণ্ঠে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং দো'আ করেন। তিনি মা-বোনদেরকে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং তাদের সন্তানদেরকে 'সোনামণি' ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সদস্য করার আহ্বান জানান। এই সময় স্থানীয় জনগণের পক্ষ হ'তে অত্রাঞ্চলে আমীরে জামা'আতের মরহুম পিতা মাওলানা আহমাদ আলী ও অন্যান্য আলেমদের নিঃস্বার্থ অবদানের কথা বর্ণনা করা হ'লে তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নগরঘাটা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব তাজুল ইসলাম সরদারের পূর্বামন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে সাতক্ষীরা থেকে রাজশাহী ফেরার পথে দুপুর ১-৩০ মিনিটে সেখানে উপস্থিত হন। অতঃপর বাদ যোহর আমীরে জামা'আতের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জামে মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। এ সময়ে মসজিদের সামনে শামিয়ানার নীচে বসে এবং পাশে দাঁড়িয়ে শত শত মুছল্লী এবং মসজিদ সংলগ্ন দু'পাশের বাগানে দাঁড়িয়ে বিপুল সংখ্যক মহিলা আমীরে জামা'আতের বক্তব্য শ্রবণ করেন। আমীরে জামা'আতের আগমন উপলক্ষে উক্ত গ্রামে ও আশেপাশে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা সহ তাঁকে স্বাগত জানানো এবং রাস্তার দু'পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে যুবক-বৃদ্ধ ও বাচ্চাদের মুহুর্মুহু শ্লোগানে চারিদিকে মুখরিত হয়ে ওঠে। গোটা গ্রামে ও এলাকায় যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

সুধী সমাবেশে বক্তব্য শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফর সঙ্গীদের নিয়ে জনাব তাজুল ইসলাম চেয়ারম্যানের বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁর সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শূরা সদস্য ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ও অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম ও সদস্য আনীসুর রহমান, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান জনাব শফীকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর হোসাইন সহ যেলার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও নেতৃবৃন্দ। অতঃপর বিকাল ৪-টার সময় আমীরে জামা'আত রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং রাত্রি ১১-টায় মারকাযে পৌঁছেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

এলাকা সম্মেলন

কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা ৬ এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কাকডাঙ্গা এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় বালিয়াডাঙ্গা বাজারে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছহীলুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আনোয়ার এলাহী।

কর্মী সমাবেশ

গুরুদাসপুর, নাটোর ৪ মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে গুরুদাসপুর থানাধীন নাজিরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলাউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী, সহ-সভাপতি মাওলানা আবুবকর। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী প্রমুখ।

দারুশা, রাজশাহী ৬ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর দারুশা বাজার সংলগ্ন দেওয়ানপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে স্থানীয় তাওহীদ পাঠাগারের উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের পরিচালক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব। সমাবেশে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা হ'তে বিপুল সংখ্যক কর্মী যোগদান করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে সূরা আছরের তাৎপর্য তুলে ধরে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। এ সময়ে সকলে একমত হ'লে উপস্থিত শ্রোতাদেরকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করানো হয়। অতঃপর মাওলানা আযীযুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ সাবিয়ার রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট দারুশা শাখা 'আন্দোলন'-এর কমিটি এবং মাহফূযুর রহমানকে সভাপতি ও ইয়াহইয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দারুশা এলাকা কমিটি গঠন করা হয়।

কর্মী প্রশিক্ষণ

আনন্দনগর, নওগাঁ ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে শহরের উপকণ্ঠে আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ প্রমুখ।

কমিটি গঠন

বিশ্বরোড মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ২২শে এপ্রিল, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বিশ্বরোড মোড় সংলগ্ন জনাব আফতাবুদ্দীন চেয়ারম্যানের বাসভবনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। বৈঠকে অধ্যাপক জগলুল আলমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আইনুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট শাহ নে'মতুল্লাহ জামে মসজিদ (বিশ্বরোড মোড়) শাখা গঠন করা হয়।

দায়িত্বশীল বৈঠক

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২২ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার রহনপুর পৌরসভার জালিবাগান হাফেযিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। বৈঠকে যেলা 'আন্দোলন' ও যেলা 'যুবসংঘ (উত্তর)'-এর নেতৃবৃন্দ এবং অত্র মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মসজিদ উদ্বোধন

বাবুডাইং, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২২ এপ্রিল শুক্রবার : পদ্মার ভাঙ্গনে বাস্তুহারা অন্যূন ২০টি পরিবার যেলার সদর থানাধীন বাবুডাইংয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন কয়েক মাস আগে। সহায় সম্বল বলতে তাদের কিছুই নেই। সর্বস্ব বিলীন হয়ে গেছে পদ্মা গর্ভে। অথচ এক সময় তারাও ছিলেন বিত্তশালী অথবা মধ্যবিত্ত। গত ২২ এপ্রিল শুক্রবার জুম'আর ছালাত উদ্বোধন উপলক্ষে সেখানে গমন করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। মসজিদের জন্য নির্ধারিত স্থানে খোলা আকাশের নীচে উপরে শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে সামান্য মাটি ভরাট করে শুরু হয় জুম'আর ছালাত। মিম্বর হিসাবে কাঠের তিনটি উচু-নীচু পিড়িতে দাঁড়িয়ে প্রস্তাবিত বাবুডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদের উদ্বোধনী খুৎবা প্রদান করেন তিনি। খুৎবায় তিনি রাসূলের যামানার খেজুর পাতার মসজিদের স্মৃতিচারণ করে যেকোন মূল্যে দ্বীনে হক তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর টিকে থাকার জন্য মুছল্লীদের প্রতি আহ্বান জানান। এ সময়ে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, যেলা 'যুবসংঘ' (উত্তর)-এর সভাপতি মুখতার হোসাইন। আরও উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শুভাকাংখী সূর্য নারায়ণপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আফতাবুদ্দীন। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন তাঁর পুত্র জনাব গোলাম কিবরিয়া।

মারকায সংবাদ

১। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্রদের কৃতিত্ব :

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ছাত্ররা পূর্বের ন্যায় শতভাগ পাস করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। মোট ১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন জিপিএ-৫ (গোল্ডেন), ৫জন জিপিএ-৫ সহ সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে। তারা হ'ল-

(১) ইশতিয়াক আহমাদ (নওগাঁ, জিপিএ-৫), (২) সাখাওয়াত হোসাইন (রাজশাহী, জিপিএ-৫), (৩) মুহাম্মাদ আরীফুর রহমান (জামালপুর, জিপিএ-৫), (৪) মুহাম্মাদ সেলিম শহরিয়ার (কুষ্টিয়া, জিপিএ-৫), (৫) মুহাম্মাদ আকমাল হোসাইন (রাজশাহী, জিপিএ-৫), (৬) আসাদুযযামান (গাইবান্ধা, জিপিএ-৫), (৭) আব্দুর রহমান বিন বুরহান (রাজশাহী, জিপিএ-৪.৯৪), (৮) মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসাইন (সিরাজগঞ্জ, জিপিএ-৪.৮৮), (৯) মুহাম্মাদ আবু সাঈদ (রংপুর, জিপিএ-৪.৭৫), (১০) মুহাম্মাদ মঈনুদ্দীন (নওগাঁ, জিপিএ- ৪.৭৫), (১১) মুহাম্মাদ রবীনুযযামান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, জিপিএ-৪.৭৫), (১২) আব্দুল্লাহ (সিরাজগঞ্জ, জিপিএ-৪.৫৬), (১৩) যুবায়ের বিন মুহাম্মাদ (নাটোর, জিপিএ-৪.৫০), (১৪) মুহাম্মাদ শাহ আলম (সিরাজগঞ্জ, জিপিএ-৪.৪৪), (১৫) আব্দুল্লাহ বিন মুযযাম্মিল (রাজশাহী, জিপিএ-৪.২৫), (১৬) মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয (নওগাঁ, জিপিএ-৪.১৩), (১৭) শামীম আহমাদ (নওগাঁ, ৩.৫৬), (১৮) ওয়ালিউল্লাহ (রাজশাহী, জিপিএ- ৩.৭৫), (১৯) মুহাম্মাদ ছিফাত আলম (রাজশাহী জিপিএ-৩.৩১)।

২। দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব :

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসা বাঁকাল, সাতক্ষীরার ছাত্ররা পূর্বের ন্যায় শতভাগ পাসের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। মোট ১৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২জন জিপিএ-৫ সহ সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে। এরা হ'ল-

(১) আখতারুযযামান (রাজাপুর, সাতক্ষীরা; জিপিএ-৫), (২) মুর্তাযা আহসান (বুলারাটি, সাতক্ষীরা; জিপিএ-৫), (৩) ওবায়দুল্লাহ (পাঁচপাড়া, সাতক্ষীরা; ৪.৯৪), (৪) মাকছূদুর রহমান (গড়েরকান্দা, সাতক্ষীরা; ৪.৯৪), (৫) শরীফুল ইসলাম (খড়িবিলা, সাতক্ষীরা; জিপিএ-৪.৮৮), (৬) আবু বকর ছিদ্দীক (বাঁকাল, সাতক্ষীরা; জিপিএ-৪.৮৮), (৭) ফাতিনা ফেরদৌস (বুলারাটি, সাতক্ষীরা; ৪.৮৮), (৮) যাকিয়া সুলতানা (খড়িবিলা, সাতক্ষীরা; ৪.৮১), (৯) আল-সাবা (পশুখালী, সাতক্ষীরা; ৪.৮১), (১০) মুস্তফা কামাল (কাযীরহাট, সাতক্ষীরা; ৪.৭৫), (১১) ছিদ্দীকুর রহমান (ইটাগাছা, সাতক্ষীরা; ৪.৫০), (১২) আযীযুর রহমান (সাতক্ষীরা সদর; ৪.৩৮), (১৩) আসাদুযযামান (ইটাগাছা, সাতক্ষীরা, জিপিএ-৪.১৯), (১৪) দেলোয়ার হোসাইন (সাতক্ষীরা সদর; ৩.৯৪)।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান : গত ১৫মে দুপুর ১২-টায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া মসজিদে ২০১১ সালে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের সুপার মাওলানা আহসান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অত্র প্রতিষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

হেফয বিভাগের ছাত্র 'সোনামণি' সদস্য তাওহীদুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জাগরণী পরিবেশন করে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সোনামণি আলমগীর হোসাইন, রাশেদুযযামান ও হাসীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরবী জাগরণী পরিবেশন করে বুরহানুদ্দীন (নবম শ্রেণী), হাবীবুর রহমান (১০ম শ্রেণী), ফরহাদ হোসাইন (৮ম শ্রেণী) ও মাস'ঊদ রেযা (৮ম শ্রেণী)। আরবী কথোপকথন পরিবেশন করে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র আসীফুর রহমান ও সাঈদুর রহমান। ইংরেজী কথোপকথন পরিবেশন করে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র ফরহাদ হোসাইন ও মাস'ঊদ রেযা এবং আরবী বক্তব্য উপস্থাপন করে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র নাঈমুর রহমান।

পুরস্কার বিতরণ শেষে আমীরে জামা'আত উত্তীর্ণ ছাত্রদের ধন্যবাদ জানান এবং যারা আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারেনি তাদের সান্ত্বনা দেন। এ সময়ে তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানে এ বৎসর থেকে 'আলিম' খোলার ঘোষণা দেন এবং উত্তীর্ণ ছাত্র ও অন্যান্য এলাকার ছাত্রদের অত্র প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : সূরা ইবরাহীমের ২৪ নং আয়াতের তাফসীর জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুজীবুর রহমান
কদমডাঙ্গা, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : অনুবাদ : 'আপনি কি দেখেননি আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? পবিত্র বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষের মত, যার মূল সুদৃঢ় ও শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত' *(ইবরাহীম ২৪)*।

অত্র আয়াতে বর্ণিত كَلِمَةً طَيِّبَةً অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' *(তাফসীর ইবনে কাছীর, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা)*। যা মুমিন নারী-পুরুষের হৃদয়ে পবিত্র বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় প্রোথিত থাকে। আর তার শাখা হিসাবে সৎ কর্ম সমূহ আসমানের দিকে উত্থিত হয়। যেমন একটি খেজুর বৃক্ষ।

উল্লেখ্য যে, অনেকে মনে করেন, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কালেমা ত্বাইয়েবাহ। আসলে তা কালেমায়ে শাহাদাত বা কালেমাতুত তাক্বওয়া *(ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২১৮, সনদ ছহীহ)*। অত্র আয়াত ও পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে তাওহীদী আক্বীদা ও কুফরী আক্বীদার ব্যবহারিক ফলাফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন (২/৩২২) : ঈদের ছালাতের দু'একদিন আগে ফিৎরা বণ্টন করা যাবে কি?

-মুফীযুদ্দীন
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ঈদের ছালাতের আগে ফিৎরা বণ্টন করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং পরে বণ্টনের প্রমাণ পাওয়া যায় *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩)*। তবে ঈদের ছালাতের পূর্বে দায়িত্বশীলের কাছে ফিৎরা জমা করা ওয়াজিব *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫)*। উল্লেখ্য যে, অনেকে হাদীছে উল্লেখিত 'আদায় করা' শব্দের অর্থ করেন 'বন্টন করা'। বরং তা হবে জমা করা। যেমন-

عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الـــذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين.

ইবনু ওমর (রাঃ) ঈদের দুই বা একদিন আগে জমাকারীর কাছে ফিৎরা পাঠাতেন *(মালেক হা/৩৪৩; ইবনু খুযায়মাহ হা/২৩৯৭, সনদ ছহীহ)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

قلت وهذا يبين أن قوله في رواية البخاري للذين يقبلونها ليس المراد به الفقراء بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر ويؤيد ذلك ما وقع في رواية ابن خزيمة.

(ইরওয়াউল গালীল ৩/৩৩৫ পৃঃ)। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)ও একই কথা উল্লেখ করেছেন *(বিস্তারিত দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৩/৪৩৯-৪০, হা/১৫১১-এর ব্যাখ্যা)*।

যারা মনে করেন ঈদের ছালাতের পূর্বে বণ্টন করা হ'লে গরীবদের সুবিধা হবে। কিন্তু উক্ত মর্মে যে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে তা গ্রহণযোগ্য নয় *(ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪৪, ৩/৩৩২)*। উল্লেখ্য যে, ফিৎরা হ'ল জানের ছাদাক্বা, মালের ছাদাক্বা নয়। ঈদের দিন সকালেও যদি কেউ মৃত্যুবরণ করেন, তার জন্য ফিৎরা আদায় করা ফরয নয়। আবার ঈদের দিন সকালে কোন বাচ্চা জন্ম নিলে তার পক্ষে ফিৎরা আদায় করতে হবে *(দ্রঃ মির'আত ৬/১৮৫)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : কোন বিধর্মী লোক সালাম দিলে তার জবাবে কি বলতে হবে?

-শফীকুল ইসলাম
সদর হাসপাতাল, পাবনা।

উত্তর : কোন বিধর্মী লোক সালাম দিলে উত্তরে শুধু 'ওয়া আলাইকা' (وَعَلَيْكَ) অথবা 'ওয়া আলাইকুম' (وَعَلَيْكُمْ) বলবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৩৬-৩৭)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থের ৭৪ এবং ১১৬ নং হাদীছের অনুবাদ জানতে চাই।

-মাকছূদুর রহমান
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : (১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়নায় মুখ দেখতেন তখন বলতেন, اللهم كَمَاحَسَّنْتَ خَلْقِى فَحَسِّنْ خُلُقِـــى 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেমন সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর করুন' *(ইরওয়াউল গালীল হা/৭৪)*।

উল্লেখ্য যে, 'ওয়া হার্রিম ওয়াজহী 'আলান নার' মর্মে বাড়তি অংশ যোগ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(ইরওয়াউল গালীল হা/৭৪)*।

(২) আবু আইয়ূব আনছারী এবং উম্মে হাবীবা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ

করবে সে যেন ওযূ করে' *(আহমাদ, ইরওয়া হা/১১৬, ১১৭; মিশকাত হা/৩৯০)*।

উক্ত হাদীছে ওযূ বিনষ্ট হওয়ার কথা এসেছে। কিন্তু অন্য হাদীছে এসেছে যে, এটা শরীরের একটি অংশ মাত্র। যা স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে না *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২০)*।

উভয় ছহীহ হাদীছের সমন্বয় এই যে, যৌন উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে, নইলে নয় *(টীকা দ্রঃ মিশকাত হা/৩২০)*।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করে দো'আর অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
সাতক্ষীরা।

উত্তর : যাবে না। কেননা মৃতের জন্য এরূপ আমল রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ থেকে প্রমাণিত নয়। মৃতের জন্য দো'আ করা ও ছাদাক্বা করা যাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৫০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৯০)*। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির নামে প্রচলিত কুলখানী, চেহলাম, দো'আর অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিদ'আত।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : গলায় ফাঁস দিয়ে বা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে তার জানাযা করা যাবে কি?

-সুমাইয়া
গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার।

উত্তর : জানাযা করা যাবে। তবে বুযর্গ আলেম ও মসজিদের ইমাম অংশ গ্রহণ করবেন না *(যাদুল মা'আদ ১/৪৯৬)*। কারণ এমন ব্যক্তির জানাযা নবী করীম (ছাঃ) নিজে পড়েননি। অন্যকে পড়তে বলেছেন *(আবুদাউদ হা/৩১৮৫; তিরমিযী হা/১০৬৮)*।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : কোন লোক যদি আমার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে আমি কি তার জন্য আল্লাহ্র নিকট লা'নত করতে পারব? না তার জন্য হেদায়াতের দো'আ করব?

-হাসনা হেনা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : যার ক্ষতি করা হয়, সে ক্ষতিকারীর অনুরূপ ক্ষতি করতে পারে *(বাক্বারাহ ১৯৪)*। তবে ক্ষতি না করে ক্ষমা করে দিয়ে ভাল আচরণ করাই উত্তম *(হামীম সাজদাহ ৩৪)*। এমনি এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি ফিৎনা কালে আদমের উত্তম পুত্রের ন্যায় (হাবীলের ন্যায়) আচরণ কর (প্রতিশোধ নিয়ো না) *(আবু দাউদ হা/৪২৫৭, ৫৯; মিশকাত হা/৫৩৯৯ 'ফিৎনা' অধ্যায়)*। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) শত্রুদের বিরুদ্ধে লা'নত করেছেন। তিনি ৭০ জন ছাহাবীকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যাকারী রা'ল ও যাকওয়ান কওমের বিরুদ্ধে লা'নত করে একমাস যাবৎ কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবু দাউদ, মিশকাত হা/১২৮৯-৯০)*। তিনি ব্যক্তি স্বার্থে কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। তবে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠায় কোন ছাড় দিতেন না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮১৭)*। তিনি বলেন, আমি লা'নতকারী হিসাবে প্রেরিত হইনি। বরং রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১২)*। অবাধ্য দাওস কওমের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করতে বলা হ'লে তিনি তাদের জন্য দো'আ করে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি দাওস কওমকে হেদায়াত কর এবং তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৬)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : বহু পুরাতন মসজিদের পশ্চিম দেয়াল থেকে শুরু করে উত্তর দিক ঘিরে প্রায় ৫০টি কবর রয়েছে। উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি?

-মহিদুল ইসলাম
আন্ধারিয়াপাড়া, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মসজিদে ছালাত হবে না। মসজিদ স্থানান্তর করতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় কর না এবং কবরের উপর ছালাত আদায় কর না *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০১৬)*। তবে কবরস্থানের জন্য পৃথক প্রাচীর দিয়ে মসজিদকে আলাদা করে নিলে ছালাত বৈধ হবে।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : জুম'আর সুন্নাত কত রাক'আত? এই সংখ্যা নিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি রয়েছে। সঠিক রাক'আত সংখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রিযওয়ান
ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

উত্তর : জুম'আর ছালাতের পূর্বে তাহিইয়াতুল মসজিদ দু'রাক'আত ব্যতীত নির্ধারিত কোন রাক'আত সংখ্যা নেই। খুৎবার আগ পর্যন্ত যত রাক'আত সম্ভব দুই দুই রাক'আত করে পড়বে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮২)*। খুৎবা শুরুর আগে বা পরে মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়বে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১)*। জুম'আর পর চার রাক'আত সুন্নাত পড়বে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬)*। উল্লেখ্য, জুম'আর আগে চার রাক'আত পড়া সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/১১২৯)*।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : কবরে সওয়াল-জওয়াবের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সেখানে কিভাবে দেখানো হবে?

-সোহরাব
লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : সেখানে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখানো হবে বলে কোন প্রমাণ নেই। বরং রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে তার ধারণা ও আক্বীদা কি, প্রশ্নের মাধ্যমে সেটাই যাচাই করা হবে *(মির'আতুল মাফাতীহ হা/১৩১-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : জারজ সন্তান প্রতিপালন করা যাবে কি? এজন্য ঐ ব্যক্তি কোন ছওয়াব পাবে কি?

-রফীক আহমাদ

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : পরিচিত বা অপরিচিত যেকোন জারজ সন্তান পালন করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যভিচারিণী গামেদী মহিলার জারজ সন্তানকে জনৈক ছাহাবীর হাতে দিয়ে তাকে লালন-পালনের জন্য আদেশ করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২)*। কারণ জারজ হওয়ার জন্য সন্তান দায়ী নয়। অতএব তাকে লালন-পালনের জন্য অবশ্যই ছওয়াব রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষ বা নারী যে কোন সৎকর্ম করলে আমরা তার বিনিময়ে সর্বোত্তম প্রতিদান দেব' *(নাহল ৯৭)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : পিতা ছেলেকে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করার জন্য অছিয়ত করে গেলে আগে অছিয়ত পালন করতে হবে না সম্পদ বণ্টন করবে?

-হামীদুল ইসলাম
খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : আগে পিতার অছিয়ত পালন করবে, তারপর সম্পদ বণ্টন করবে। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে অছিয়ত বাস্তবায়ন ও কর্য পরিশোধের আদেশ দিয়েছেন *(নিসা ১১-১২)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কত জায়গায় কুরআনকে হাদীছ বলেছেন?

-আমীনুল ইসলাম
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

উত্তর : ১৪টি স্থানে আল্লাহ কুরআনকে 'হাদীছ' বলেছেন। যেমন নিসা ৭৮ ও ৮৭, আ'রাফ ১৮৫, ইউসুফ ১১১, কাহফ ৬, ত্বোয়া-হা ৯, যুমার ২৩, জাছিয়াহ ৬, তূর ৩৪, নাজম ৫৯, ওয়াক্বি'আহ ৮১, ক্বলম ৪৪, মুরসালাত ৫০ ও গাশিয়াহ ১ *(দ্রঃ থিসিস পৃঃ ৩৬)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : শুক্রবারে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং সেদিন কেউ মারা গেলে বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যায়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল বাতেন
স্থলচর, এনায়েতপুর, পাবনা।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। তবে কোন মুসলিম ব্যক্তি শুক্রবারে মারা গেলে সে কবরের ফিৎনা হ'তে বেঁচে যাবে মর্মে ছহীহ দলীল রয়েছে *(আহমাদ, তিরমিযী হা/১০৯৫, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৩৬৭, 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ)*। এখানে 'ফিৎনা' বলতে সওয়াল-জওয়াব ও কবরের আযাব বুঝানো হয়েছে। এটি ব্যতিক্রম বা খাছ বিষয়। এর মধ্যে যুক্তির কোন সুযোগ নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্থান ও কালের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। *(দ্রঃ মির'আত ৪/৪৪০-৪১)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : জনৈক ব্যক্তি খুবই আমলদার ছিলেন। তিনি মারা যাওয়াতে অনেকে কষ্টও পেয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া বিদ'আতী। তার কোন আমল কাজে আসবে কি?

-মহীদুল ইসলাম
সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তর : কোন ব্যক্তির আমল যদি ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক না হয়, তাহ'লে তা আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। 'সেটাকে সুন্দর আমল মনে করলেও ঐব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(কাহফ ১০৩-৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কেউ যদি এমন কোন আমল করে, যার নির্দেশ আমাদের পক্ষ থেকে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। অতএব বিদ'আতীর কোন আমল পরকালে কাজে লাগবে না।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : বর্তমানে জমি বন্ধক নেওয়া হচ্ছে এভাবে- দশ বা ত্রিশ হাযার টাকা কেউ অন্যের নিকট থেকে নিচ্ছে এক বিঘা বা দুই বিঘা জমি তাকে দিচ্ছে। ঐ টাকা যতদিন ফেরত না দিবে ততদিন সে জমি ভোগ করতে থাকবে। উক্ত পদ্ধতি কি শরী'আত সম্মত ?

-শাহাদত
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়। কারণ ঋণের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করা সূদের অন্তর্ভুক্ত। যদিও সেটা উভয়ের সম্মতিক্রমে হয়। সেখান থেকে কিছু টাকা ছেড়ে দিলে 'হালাল' হবে বলে যে কথা সমাজে চালু আছে সেটিও হীলা বা অপকৌশল মাত্র। কেবলমাত্র টাকা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার স্বার্থে কোনরূপ লাভ না নিয়ে জমি বন্ধক নেয়া শরী'আত সম্মত *(দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৯৬; বুখারী, মিশকাত হা/২৮৩৩ 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*। জমি তার মালিকের ব্যবহারে থাকবে, যাতে সে তার উৎপন্ন ফসলের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে জমিটি ঋণদাতার নামে বন্ধকী রেজিষ্ট্রি থাকবে, যাতে তার ঋণের টাকা মার না যায়। ঋণ দেওয়ার সময় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়ত থাকতে হবে, দুনিয়াবী লাভের নিয়ত রাখা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'কে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করবে? তিনি তাকে দ্বিগুণ ও বহু গুণ প্রতিদান প্রদান করবেন। আল্লাহ রূযী সংকুচিত ও বর্ধিত করে থাকেন। আর তাঁর নিকটেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : দশ বছর বা পাঁচ বছরের আগাম চুক্তিতে আম গাছের পাতা বিক্রি করা হচ্ছে। কোথাও মুকুল বিক্রি করা হচ্ছে। উক্ত পদ্ধতিতে আম বাগান বিক্রি করা কি বৈধ? অনেকে এভাবে আম বিক্রি করে হজ্জে যাচ্ছেন। তার হুকুম কি হবে?

-শামসুযযামান
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : ফল খাওয়ার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফলদার গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৩৯)*। কারণ এতে ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে

এবং এটি সম্পদের মালিকানা অর্জনের পূর্বেই তা বিক্রি করার আওতাভুক্ত। পাতা কেনা বা মুকুল কেনা সবই এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত।

হালাল উপার্জন যেহেতু ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত *(বাক্বারাহ ১৬৮)*, তাই হারাম পন্থায় উপার্জন করে সেই টাকা দিয়ে হজ্জ করলে হজ্জ কবুল হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : যদি ছেলে বিদেশে থাকে আর মেয়ে দেশে থাকে, তাহ'লে মোবাইলের মাধ্যমে তাদের বিবাহ বৈধ হবে কি?

-তাসেমুল হক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উভয় পক্ষ পরস্পরে জানাশোনা ও বিশ্বস্ত হ'লে মেয়ের অভিভাবকের উপস্থিতিতে দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীর সামনে মোবাইলের মাধ্যমে ছেলে সম্মতি প্রকাশ করলে বিবাহ সিদ্ধ হবে *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩০; ইরওয়াউল গালীল ৬/২৪০)*। কারণ বিবাহের রুকন হ'ল ঈজাব ও কবুল, আর শর্ত হ'ল- উভয়ের সম্মতি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১২৬)*। তাই উক্ত রুকন ও শর্ত পাওয়া গেলে বিবাহ হয়ে যাবে। আর টেলিফোন ও মোবাইলেও তা সম্ভব। তবে কোনরূপ ধোঁকার আশ্রয় নিলে বিবাহ বাতিল হবে।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : দাঊদ (আঃ) এক মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন মর্মে মুফাসসিরগণ যে বক্তব্য দিয়ে থাকেন তা কি সঠিক?

-হুমায়ুন কবীর
রংপুর।

উত্তর : উক্ত বিবরণটি মিথ্যা ও বানাওয়াট। ইমাম কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে এটাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন *(কুরতুবী ১৫/১৬৭ পৃঃ, সূরা ছোয়াদ ২১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ; নবীদের কাহিনী ২/১৩৬)*।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে আবুবকর (রাঃ)-কে ছিদ্দীক্ব উপাধিতে ভূষিত করা হয়?

-তামীমুল ইসলাম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : মি'রাজের ঘটনা শোনামাত্র সত্য বলে মেনে নেওয়ায় আবুবকর (রাঃ) ছিদ্দীক্ব উপাধিতে ভূষিত হন *(হাকেম, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৬)*।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অর্থ সম্পদ দ্বারা কেউ সহযোগিতা করেছিলেন কি? এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

-ডালিম
কক্সবাজার।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অনেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কা হ'তে মদীনায় আগমন করেন, তখন আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) তার বাড়ী রাসূল (ছাঃ)-কে অবস্থান করার জন্য দিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বাড়িতে প্রায় ৭/৮ মাস ছিলেন। অতঃপর মসজিদ ও বাড়ী নির্মিত হ'লে তিনি তাঁর জন্য তৈরীকৃত বাড়ীতে উঠেন *(সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৯৬)*।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : কোন অমুসলিম ব্যক্তির জন্য মুসলিম হওয়ার আগে কিছু করণীয় আছে কি? কী কাজ করলে সে মুসলিম হতে পারবে?

-আব্দুস সালাম
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের নিয়তে শুধু কালেমা শাহাদাত পাঠ করলে মুসলিম হয়ে যাবে। অর্থাৎ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ পাঠ করবে। কালেমা শাহাদাত পাঠের পূর্বে কিছু করার নেই। তবে ইয়ামামাহ্র নেতা ছুমামাহ্ ইবনু আছাল কালেমা পাঠের আগে গোসল করেছিলেন *(বুখারী হা/৪৬২; মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায় 'বন্দীদের হুকুম' অনুচ্ছেদ-৫)*। ক্বায়েস বিন আছেমকে কালেমা পাঠের পর রাসূল (ছাঃ) গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(তিরমিযী হা/৬০৫; মিশকাত হা/৫৪৩)*। ইসলাম গ্রহণের পরে গোসল করাকে সেকারণ কিছু বিদ্বান মুস্তাহাব বলেছেন *(ঐ; মির'আত ২/২৪০-৪১)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : কুরআন মজীদের ১ থেকে ৩০ পারা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কে সাজিয়ে দিয়েছেন?

শহীদুল্লাহ
সুরিটোলা, ঢাকা।

উত্তর : কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের বিন্যাস আল্লাহ্র হুকুমে জিবরীলের নির্দেশনায় রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। এটি তাওক্বীফী অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর রামাযানের প্রতি রাত্রিতে জিবরীল (আঃ) আসতেন এবং রাসূল (ছাঃ) তার নিকট কুরআন পেশ করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৮)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, বছরে একবার রাসূলের নিকট কুরআন পেশ করা হ'ত। কিন্তু মৃত্যুর বছরে দু'বার পেশ করা হয়। তিনি প্রতি বছর রামাযানে ১০ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু মৃত্যুর বছরে ২০ দিন ই'তিকাফ করেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৯৯)*। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের বর্তমান বিন্যাস আল্লাহ কর্তৃক সরাসরি নির্ধারিত। যা সংরক্ষিত ছিল উম্মুল মুমেনীন হাফছা (রাঃ)-এর নিকটে। অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাঁর কাছ থেকে নিয়ে সেভাবেই সংকলন করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২২২১)*। সূরা বাক্বারাহ ২৪০ আয়াতটি সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে ওছমান (রাঃ) বলেন, لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ 'কুরআনের কোন কিছুকেই আমি তার স্থান থেকে সরাবো না' *(বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায়, হা/৪৫৩৬)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : কোন্ কোন্ ব্যক্তির জানাযা পড়া যাবে না?

নাছরুল্লাহ
কাটেঙ্গা, তেরখাদা, খুলনা।

উত্তর : যেকোন মুসলিম আহলে ক্বিবলার জানাযা পড়তে হবে *(ইবনু মাজাহ 'আহলে ক্বিবলার জানাযা পড়া' অনুচ্ছেদ)*। আত্মহত্যাকারীর জানাযা রাসূল (ছাঃ) পড়েননি *(মুসলিম হা/৯৭৮, পৃঃ ৩০)*। অতএব মসজিদের ইমাম বা বুযর্গ আলেম তার জানাযায় শরীক হবেন না। অন্যেরা ছালাত পড়াবেন *(নাসাঈ হা/১৯৬৪)*। আর এটি ছিল তাঁর পক্ষ হ'তে অন্যকে আদব শিখানোর জন্য' *(ইবনু মাজাহ হা/১৫২৬)*।

উল্লেখ্য যে, দু'জনের জানাযা পড়া যরূরী নয়, তবে চাইলে পড়া যায়: শিশু এবং শহীদ। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ওহোদ যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়েননি *(তিরমিযী হা/১০৩৬)*। তিনি তাঁর ১৮ মাস বয়সী শিশুপুত্র ইবরাহীমের জানাযা পড়েননি *(আবুদাঊদ হা/৩১৮৭)*। তবে অন্য হাদীছে শিশুদের জানাযা পড়ার কথা এসেছে *(তিরমিযী হা/১০৩১)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : জনৈক আলেম বলেন, একদিন খলীফা ওমর (রাঃ) খুৎবা প্রদানকালে একদল কাফের এসে তাকে ৩টি প্রশ্ন করল। (ক) কোন জায়গায় সূর্যের আলো কেবল একবার পড়েছে আর কোনদিন পড়েনি। (খ) ৭জন শিশু তিনদিন বয়সে কথা বলেছে। তারা কারা (গ) একই মায়ের সন্তান জমজ দুই ভাই, একইদিনে জন্ম নেন ও একই দিনে মারা যান। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পার্থক্য ১০০ বছর। উক্ত ঘটনা কি সঠিক?

-ওছমান গণী
কানাডা।

উত্তর : উক্ত ঘটনার কোন সত্যতা পাওয়া যায় না। তবে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ৩জন শিশু সন্তান মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় কথা বলেছেন। (১) ঈসা (আঃ) (২) জুরায়েজকে অপবাদ প্রদানকারী মহিলার ব্যভিচারের সন্তান *(বুখারী হা/৩৪৩৬)*। (৩) আছহাবুল উখদূদের এক মহিলার সন্তান *(মুসলিম হা/৩০০৫)*। এছাড়া ইউসুফ (আঃ)-এর শিশু সাক্ষী ও ফেরাউনের সাক্ষী ইবনু মাশেত্বাহ কথা বলেছিল মর্মে যে কথা প্রচলিত আছে, তার সনদ যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/৪৭৫৯)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : জনৈক বক্তা বলেন, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া দুনিয়াতে জান্নাত দেখেছেন। বক্তার বক্তব্য কি সঠিক?

-ছাদিকুর রহমান
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ফেরাউন আসিয়া (রাঃ)-এর দুই হাত ও দুই পায়ে শক্ত পেরেক পুঁতে রাখত। যখন তার লোকেরা চলে যেত ফেরেশতারা তাকে ছায়া করত। আসিয়া (রাঃ) বলতেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার নিকটে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করুন এবং ফেরাউন ও তার অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে আমাকে মুক্তি দান করুন'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের ঘর উন্মুক্ত করে দেন *(মুসনাদে আবী ইয়ালা, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫০৮)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) বর্তমান আলু ও পিয়াজের আবাদ প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে এবং ব্যবসায়ী পণ্য হিসাবেও চলছে। এর ওশর দিতে হবে কি?

-আব্দুর রহীম
নখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এসবের ওশর দিতে হবে না। কেননা যমীন থেকে উৎপাদিত যে সব খাদ্য-শস্য স্বাভাবিকভাবে এক বছর পর্যন্ত থাকে না বরং তার আগেই পচন দেখা দেয়, সেগুলোর ওশর নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৩৪-৩৬)*। তবে এগুলির বিক্রয় লব্ধ টাকা যদি এক বছর সঞ্চিত থাকে এবং নিছাব পরিমাণ হয়, তাহ'লে ৪০ ভাগের ১ ভাগ হিসাবে তার যাকাত দিতে হবে *(আবুদাঊদ হা/১৫৭৩-৭৪; মিশকাত হা/১৭৯৯)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : যদি কোন মেয়েকে তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা নির্যাতন করে, আর সে যদি তা পিতাকে জানায় তাহলে গীবত হবে কি?

-তানিয়া আখতার
পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ।

উত্তর : মেয়ের কোন দোষ না থাকলে সে তার স্বামীকে জানিয়ে তার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করবে। যদি সে সমাধান করতে ব্যর্থ হয় এবং তার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব না হয় তাহলে সমাধানের লক্ষ্যে তার অভিভাবককে জানাতে পারবে এবং এর জন্য বিচার প্রার্থী হতে পারবে। অতঃপর উভয় পরিবার মিলে এর সমাধান করবে। বিচারপ্রার্থী হলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ছয়টি ক্ষেত্রে গীবত হয় না, যার একটি হ'ল অন্যায়ের জন্য বিচার প্রার্থী হওয়া *(মুসলিম হা/২৫৮৯ 'গীবত হারাম হওয়া' অনুচ্ছেদ, নববীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। তবে সমাধানের উদ্দেশ্যে না হলে গীবত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : অনেক সন্তান ভালো কাজ করতে চায়। কিন্তু পিতা-মাতা তাতে সন্তুষ্ট হয় না। তখন সন্তানের জন্য করণীয় কী?

আমীর হোসাইন
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০)*। অতএব সন্তান আল্লাহ্র আনুগত্য করলে পিতা-মাতা তাতে অসন্তুষ্ট হ'লেও কোন

সমস্যা নেই। এজন্য সন্তান গুনাহ্গার হবে না। তবে পিতা-মাতাকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : আমাদের গ্রামে একটি নতুন স্কুল তৈরী হয়েছে। তার নাম ইন্টারভিজ। স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রীর খরচ বহন করবে স্কুল কতৃপক্ষ। এর পরিচালনা কমিটি খ্রীষ্টান। এই স্কুলে মুসলিম ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে পারবে কি।

-মীযানুর রহমান
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : যদি খৃষ্টান ধর্মের আক্বীদা-বিশ্বাস কচিকাচাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে সে স্কুলে সন্তানদেরকে পড়তে দেয়া যাবে না। আর কোন গোপন উদ্দেশ্য ছাড়াই তারা ফ্রি পড়াবে, এরূপ কথা বিশ্বাস করা যায় না। অতএব এসব স্কুল থেকে মুসলিম সন্তানদের দূরে রাখা উচিত।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : বিভিন্ন মসজিদে মাগরিবের ছালাতের পর হালক্বায়ে যিকরের আয়োজন করা হয়। হালক্বায়ে যিকর অর্থ কী? এটা কি সুন্নাত সম্মত?

-সাজীদ, দুবাই।

উত্তর : গোল হয়ে বসে যিকর করাকে হালক্বায়ে যিকর বলা হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কিছুদিন পর একশ্রেণীর বিদ'আতী এই পদ্ধতি চালু করে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ইবাদতের যে সকল পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, হালক্বায়ে যিকর তার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং দলবদ্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে হালক্বায়ে যিকর করা বিদ'আত *(ড. ছালেহ বিন ফাওযান, কিতাবুত তাওহীদ পৃঃ ৭২)*।

ওমর ইবনু ইয়াহইয়া (রাঃ) বলেন, একদা মসজিদে নববীতে দলবদ্ধভাবে গোল হয়ে বসে যিকর হচ্ছিল। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) এসে খবর দিলে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) মসজিদে গিয়ে তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কী করছ? তারা বলল, 'আমরা তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ ও তাহমীদ গণনা করছি'। তখন তিনি বললেন, আসলে তোমরা তোমাদের গুনাহসমূহ গণনা করছ। এখনো ছাহাবীগণ জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাপড় এখনো অক্ষত আছে। তাঁর পানপাত্র সমূহ এখনো ভাঙ্গেনি। আর এখুনি তোমরা বিদ'আত শুরু করে দিলে? *(দারেমী হা/২০৪, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫)*।

তবে শরী'আত নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী যিকর করার অনেক ফযীলত রয়েছে। ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসীসহ অন্যান্য দো'আ সমূহ পাঠ করাকে হাদীছে যিকর বলা হয়েছে *(দ্রঃ মিশকাত 'ছালাতের পর যিকর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : মসজিদ কমিটি মসজিদের ফাণ্ড থেকে মুসাফির দুস্থদেরকে টাকা দিতে পারে কি?

-আঞ্জুয়ারা বেগম
রাজপাট, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : মসজিদের সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকলে ঐ ধরনের অন্য কোন মসজিদের কাজে অথবা মুসাফির দুস্থদের সাহায্যার্থে ব্যবহার করা যায় *(দ্রঃ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৩)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : অনেকে ছালাতের সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দো'আ পড়ে থাকেন। এর প্রমাণে ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারূণুর রশীদ
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তর : মাথায় হাত রেখে দো'আ পড়ার যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই দুর্বল *(ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত, পৃঃ ৪৫১)*। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, উক্ত বর্ণনার সনদে কাছীর নামে একজন রাবী রয়েছে, সে নিতান্ত দুর্বল। ইমাম বুখারী, আবু হাতিম, নাসাঈসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাকে অস্বীকৃত রাবী বলে মন্তব্য করেছেন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬০)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : আমাদের চল্লিশ বছরের পুরানো মসজিদে এখন মুছল্লী ধরে না। কিন্তু মসজিদ বড় করার মত জায়গাও সেখানে নেই। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদের জায়গা বিক্রি করে অথবা বদল করে অন্যত্র মসজিদ তৈরী করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ তোফাযযল
নারায়ণপুর, পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে। কুফার মসজিদে রক্ষিত বায়তুল মাল চুরি হওয়ার কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট একটি পত্র লিখেন। তখন ওমর (রাঃ) মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। এরপর উক্ত স্থানকে খেজুরের বাজারে পরিণত করা হয় *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৬-২০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২-১৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : অনেকে বলছেন, হজ্জ-এর ব্যাপারে আহলেহাদীছ ও হানাফীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কথাটা কতটুকু সত্য?

আলতাফ হোসাইন
রসূলপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : অনেক পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ কয়েকটি প্রদত্ত হ'ল : (১) আরাফা ময়দানে অবস্থানকালে তারা যোহর ও আছর জমা করেন না। বরং পৃথকভাবে প্রথম ওয়াক্তে পড়েন। যা ছহীহ হাদীছের বিরোধী (২) তারা তারতীব ওয়াজিব বলেন। অর্থাৎ তাদের মতে ১০ তারিখে মিনায় ফিরে কংকর মেরে কুরবানী করবে। অতঃপর মাথার চুল ন্যাড়া করবে অথবা ছোট করবে। অতঃপর মক্কায় গিয়ে ত্বাওয়াফে

যিয়ারত করবে। এতে আগপিছ হ'লে তাকে কাফ্ফারা স্বরূপ একটি কুরবানী দিতে হবে। (৩) তারা হজ্জে ক্বেরানকে হজ্জে তামাত্তুর চাইতে উত্তম বলেন (৪) তারা তানঈম থেকে বারবার বিভিন্ন নামে ওমরা করেন, যা ছহীহ হাদীছের বিরোধী (৫) তারা ঢাকা থেকে ইহরাম বাঁধেন, যা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। (৬) তারা অনেকে ১০ তারিখে মক্কায় গিয়ে আর মিনায় ফেরেন না। মক্কাতেই রাত্রি যাপন করেন। যা সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয (৭) তারা হজ্জের তাওয়াফ-সাঈ, ওকূফে আরাফাহ, মুযদালিফা, মিনা, কংকর মারা, যমযমের পানি পান করা প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক নিয়ত পাঠ করেন, যার কোন ভিত্তি নেই। এছাড়া বিভিন্ন ছালাতের বিভিন্ন নিয়ত পাঠের বিদ'আত তো আছেই (৮) মদীনায় গিয়ে রাসূলের কবরমুখী দাঁড়িয়ে দূর থেকে কান্নাকাটি ও প্রার্থনা করেন, যা স্পষ্টতঃ শিরক (৯) মদীনায় গিয়ে ৪০ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করাকে আবশ্যিক মনে করেন (১০) মদীনা থেকে মক্কায় যাওয়ার সময় যুল-হুলায়ফাতে গিয়ে ছালাত জমা ও কছর করাকে তারা নাজায়েয বলেন। (১১) মদীনায় গিয়ে সাতটি মসজিদে ছালাত আদায় করাকে বড়ই পুণ্যের কাজ মনে করেন। এ ধরনের আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যা ছহীহ হাদীছের বিপরীত এবং যার কারণে হজ্জ কবুল না হওয়ার আশংকা থাকে।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : ইসলামী সম্মেলন প্রজেক্টরের মাধ্যমে মহিলাদেরকে দেখানো যাবে কি?

-হাসান
২২০ বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : প্রজেক্টরের মাধ্যমে মহিলারা বক্তার বক্তব্য দেখতে ও শ্রবণ করতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষদের নিকট ঈদের খুৎবা প্রদান করার পর মহিলাদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে ওয়ায-নছীহত করেন ও ছাদাক্বা দিতে বলেন। এ সময় তারা তাদের অলংকার খুলে তা বেলালের হাতে দেন *(মিশকাত হা/১৪২৯ 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৫৭) : জাহান্নাম ভর্তি হবে না বলে আল্লাহ তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিবেন। কিন্তু জান্নাত পূর্ণ হবে, না ফাঁকা থাকবে?

-বদীউযযামান
রংপুর।

উত্তর : জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর জান্নাত ফাঁকা থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এক ধরনের সৃষ্টি দিয়ে জান্নাত পূর্ণ করবেন *(মুসলিম হা/২৮৪৮ 'জান্নাত' অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : মসজিদের মিম্বর তিন স্তর বিশিষ্ট হওয়ার কোন তাৎপর্য আছে কি? কোন কোন মসজিদে পাঁচ স্তর বিশিষ্টও দেখা যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মীযানুর রহমান
সালাফিয়া মাদরাসা, রংপুর।

উত্তর : মিম্বর তিন স্তর বিশিষ্ট হওয়ার বিশেষ কোন তাৎপর্য পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন স্তর বিশিষ্ট মিম্বর ব্যবহার করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৪১৪; আওনুল মাবুদ হা/১০৭৬ -এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। মু'আবিয়া (আঃ)-এর খেলাফত কালে মদীনার গবর্নর মারওয়ান আরও তিন স্তর বৃদ্ধি করে মোট ছয় স্তরে উন্নীত করেছিলেন *(ফাৎহুল বারী ২/৪৬৩; আওনুল মাবুদ, পৃঃ ২৯৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : জনৈক ইসলামী বক্তা টিভিতে আলোচনা করতে গিয়ে বায়হাক্বীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নবী-রাসূলগণ কবরে ছালাত আদায় করছেন। উক্ত কথার সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ফিরোয খান
মাশাইল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক *(মুসনাদে বাযযার, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬২১; মুসলিম হা/৬১০৭; দালায়েলুন নবুওয়াত লিল বায়হাক্বী হা/৬৫৩)*। তবে সেটা বারযাখী জীবন, যা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। ঐ ছালাত দুনিয়াবী ছালাতের সাথে তুলনীয় নয়।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : আমার আব্বা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে কিছু জমি দিতে চেয়েছিলেন। তাই সেখানে দোতলা বাড়ী তৈরী করি। কিন্তু দলীল করার পূর্বেই তিনি মারা যান। এক্ষণে আমার সৎ মা ও আত্মীয়-স্বজন তা অস্বীকার করছে। উক্ত বিষয়ে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাহিদুল ইসলাম
মাধবদী, নরসিংদী।

উত্তর : পিতা যদি তার সকল ছেলে-মেয়েকে অনুরূপ জমি দান করে থাকেন, তাহ'লে সৎ মা বা অন্যদের বাধা প্রদান করা ঠিক হবে না। কিন্তু পিতা যদি শুধু এক ছেলেকেই উক্ত জায়গা দিয়ে থাকেন, তাহ'লে কুরআন-হাদীছের আলোকে অংশ মোতাবেক ওয়ারিছদের মাঝে তা বণ্টন করতে হবে। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতা আমকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে এসে বললেন, আমি আমার এ ছেলেকে একটি গোলাম প্রদান করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে এরূপ দিয়েছ? সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তাহলে তুমি তোমার উক্ত ছেলের নিকট হতে গোলামটি ফিরিয়ে নাও *(মুসলিম হা/৪১৫৪)*।